2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩

স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং পুনরুদ্ধারে
টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেন,

‘আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য, বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এটা হলো বেরিয়ার, এটা যদি রক্ষা করা না হয়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত এরিয়া সমুদ্রে তলিয়া যাবে এবং হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোনো উপায় আর নাই।’

সূত্র : সফিউল আযম; বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ প্রেম [প্রকাশিত : ১১:২৪ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২০]
Jagonews24.com

2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নগরায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফল নয় বরং এর প্রকৃত চালিকাশক্তি। শহরগুলির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের জন্য স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি অপরিহার্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূত্র: বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মরণিকায় প্রদত্ত বাণী।

2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিকল্পিত নগরায়ন
দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
অর্জনে অন্যতম নিয়ামক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলা জরুরি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর অভীষ্ট ১১-তে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার টেকসই শহর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, মৌলিক সেবায় পর্যাপ্ত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নিম্নবিত্তদের আবাসন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recovery' অর্থাৎ 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রুপান্তরিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরায়ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম নিয়ামক। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ ২০২২-৩৫) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য, পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে। অমি আশা করি, আগামী দিনের নগর হবে দুর্যোগ সহনশীল এবং ভবন নির্মাণবিধি সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আবাসন হবে নিরাপদ।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী:

যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করে মানবজাতির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান

সূত্র : বাসস, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

‘বিশ্ব বসতি দিবস’ পালনের ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Resilient urban economics. Cities as drivers of growth and recovery’ অর্থাৎ ‘স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি’ কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ের জন্য যথাযথ বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন; যাতে দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে নগর ও গ্রামাঞ্চলের সুষম উন্নয়ন হয়। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার নগরগুলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। আমাদের সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন– মেট্রোরেল প্রকল্প, পদ্মা সেতু প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, বিভিন্ন উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এবং আশ্রয়াণ প্রকল্প নগরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে।

শহরগুলো হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দু। নগরায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফল নয় বরং এর প্রকৃত চালিকাশক্তি। শহরগুলির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের জন্য স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি অপরিহার্য। নগরের অর্থনীতি স্থিতিশীল না হলে কী ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে কোভিড-১৯ এর সময় লক্ষ্য করা গেছে। কোভিড-১৯ বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে মন্থর করে দিলেও আমাদের সরকার এ অতিমারী মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে, যা আজ বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের আলোকে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’ এর মাধ্যমে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশে আর কোনো গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষ থাকবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ হতে ২৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে স্থিতিশীল ও উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশের আপামর জন সাধারণের সার্বিক সহযোগিতা পাবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ লক্ষ্যে আমরা ভিশন ২০৪১ ঘোষণা করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। বাস্তবায়িত হবে জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩’-এর সার্বিক সাফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে
দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ
উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ'

2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

প্রতিবছরের মতো এবারো সাড়ম্বরে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'Resilient urban economics. Cities as drivers of growth and recovery'. বাংলায় এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে, "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি সে দেশের নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সাম্প্রতিক করোনা মহামারীর কারণে সারাবিশ্বে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি শহর ও নগরসমূহ মাসের পর মাস লকডাউনে স্থবির হয়ে থাকে। এতে পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত সকল দেশ অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সংকট উত্তরণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে দেশের করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শুরু হয় নতুন তৎপরতা।

করোনা মহামারীর অভিঘাত কাটিয়ে উঠতেন না উঠতেই শুরু হয় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে পাল্টাপাল্টি স্যাংশন আরোপের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা দেয় জ্বালানি সংকট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও নিম্নমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অনেক দেশই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে পতিত হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে আবাসন শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়। নতুন করে অনেক দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। এই সংকট উত্তরণে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার যথেষ্ট সফলতার সাথে এ সংকট মোকাবিলা করছে। বিশ্ব অর্থনীতির সংকটময় এ পরিস্থিতিতেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.১ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামো, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ উন্নয়নের মৌলিক সূচকসমূহ যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বৃহৎ বাজেটের মেগা প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের আবাসন খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৪০ হাজারেও বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ভূমি বরাদ্দ ও গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয়কেন্দ্র। নিজ দেশে নির্যাতিত ও গণহত্যার স্বীকার ১০ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক বহুতল ভবন। বিপুলসংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণের মাধ্যমে নাগরিকদের আবাসন চাহিদাপূরণের পাশাপাশি টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। রাজধানীর মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো প্রায় ২৫ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলমান উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করবে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি হবে দেশের এই আর্থিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এই কর্মসূচি সফল করতে যাদের অক্লান্ত শ্রম, তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শরীফ আহমেদ এমপি

বিশ্ব অর্থনীতির সংকটময় এ
পরিস্থিতিতেও ২০২২–২৩ অর্থবছরে দেশের
জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.১ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে

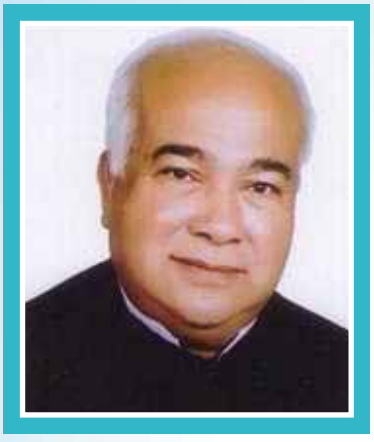

সভাপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অনান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Resilient urban economics. Cities as drivers of growth and recovery' যার বাংলা রূপ "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি যুগোপযোগী এবং যথাযথ বলে আমি মনে করি।

নগরই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। প্রাচীনকাল থেকেই নগরগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আধুনিক নগরায়নে অসংখ্য সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও ভৌত অবকাঠামো, বাণিজ্য সেবাসমূহের সহজপ্রাপ্যতা, বহুমুখী দক্ষ জনশক্তির কারণেই মূলত নগরকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নগরায়ন ও উন্নয়ন অত্যন্ত ইতিবাচক ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের অভিযাত্রায় আগামী দিনগুলোতে নগরায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমান্তরালভাবে এগিয়ে যাবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরে এখন "স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে বর্তমান সরকার, যেখানে নাগরিকেরা যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং যার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালন করবে। যার ফলে ভবিষ্যৎ স্মার্ট সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা "আমার গ্রাম-আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"। এ লক্ষ্যে সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও নিরাপদ আবাস গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম দর্শন। রুপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সফল বাস্তবায়ন, সর্বোপরি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, এমপি

স্মার্ট সাশ্রয়ী, টেকসই
জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী
বাংলাদেশ গড়ে উঠবে

2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

জাতিসংঘের কমিশন অন হিউম্যান সেটেলমেন্ট এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হচ্ছে। বর্তমানে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ শহরে বসবাস করে। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬১ শতাংশ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৬৮ শতাংশ জনসংখ্যা শহরে বসবাস করবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে যার বার্ষিক বৃদ্ধি ৬ শতাংশ। নগরায়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫১ সালের মধ্যে দেশের ৫৫ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা মহানগরীতে প্রতি বছর ৫ লাখের বেশি মানুষ যোগ হচ্ছে যার ফলে ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে মোট অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ লাখ।

বর্তমানে প্রান্তিক এলাকা হতে অজস্র লোক মেগাসিটিতে স্থানান্তর হচ্ছে, তা রোধ করা যাচ্ছে না। কী কারণে মানুষ শহরমুখি হচ্ছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষের সুযোগ সুবিধা যেমন: নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, আধুনিক পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, ভালো মানের স্কুল, উন্নত মানের হাসপাতাল, আধুনিক শপিং মল এবং নগর জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হলেও ভোগ করার আর্থিক সামর্থ্য আপামর গ্রামীণ জনসাধারণের নেই। সে কারণে, শহরের মত গ্রামের মানুষের জন্য উন্নত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উন্নত ফার্মিং, আইসিটি ও সেবা খাতের কাজের সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কাঙ্ক্ষিত সেবা ক্রয় করতে পারবে। এতে শহরমুখি জনতার স্রোত রোধ করা সম্ভব হবে।

স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দেশের টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা বাংলাদেশের শহরগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত রাখতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত একটি কর্মপরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিত নগরায়ণ টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০৪১-এর আলোকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা মহানগরীর টেকসই ও পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ ভবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) ২০২০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বস্তিবাসীদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মিরপুরে ৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ভাড়াভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ছনপাড়া, গাজীপুরের দত্তপাড়া এবং কেরানীগঞ্জে বস্তিবাসী/স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে।

জমির অপ্রতুলতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ন ও শিল্পায়ন সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি শহরে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন নিশ্চিত ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে স্থিতিশীল নগরী গড়ে উঠবে- যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশবাসীকে বিনামূল্যে কোভিড টিকা প্রদান, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে দেশবাসীর আর্থিক এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রবৃদ্ধিসহ সামনে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শহর/মহানগরসমূহ এখনো বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। একইসাথে ক্রমবর্ধমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য “Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recover” বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গধহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কাজী ওয়াছি উদ্দিন

রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী
আর্থিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ
যথেষ্ট প্রবৃদ্ধিসহ সামনে এগিয়ে চলছে

অতিরিক্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৭ আশ্বিন ১৪২৯
০২ অক্টোবর ২০২৩

সম্পাদকীয়

বাসযোগ্য, নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে সারাবিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এ বছরও অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে আগামী ০২ অক্টোবর দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ২০২৩ সালের জন্য প্রতিপদ্য নির্ধারণ করছে 'Resilient urban economics. Cities as drivers of growth and recovery'। প্রতিপাদ্যটির বাংলা ভাবার্থ, 'স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকা শক্তি', নির্ধারণ করে এদেশে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারি ও মানব সৃষ্ট সংকট মানব সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করেছে। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে টেকসই নগর বিনির্মাণ অপরিহার্য। জমির অপ্রতুলতা, নগরায়ন ও শিল্পায়ন সবকিছু বিবেচনায় এনে শহর-গ্রামে প্রতিটি জনবসতিতেই এখন পরিকল্পিত উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন আবাসন নির্মাণ জরুরি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমন্বিত নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনিই যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশর নগর ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিত এক বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলের জন্য পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাট নির্মাণে নির্দেশনা দিয়েছেন। পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য সকল এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, নিম্ন আয়ের বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজউক, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার দুর্যোগ সহনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাতে এলাকাভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে এবং এলাকার সকল মানুষ উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে। এছাড়া অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও গ্রামাঞ্চলের সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করছে এবং হাউজ এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এইচবিআরআই) পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পরিবেশবান্ধব ফাঁপা সিমেন্ট ব্রিক এর উদ্ভাবনসহ এর ব্যাপক প্রসারের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ফলে দেশের সকল মানুষ ও স্থান দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে নগর অর্থনীতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি নিজেক ধন্য মনে করছি। স্মরণিকার জন্য লেখা সংগ্রহ, যাচাই/বাছাই, লেখার বিন্যাসসহ ছাপাখানার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা, প্রচ্ছদ তৈরি ইত্যাদি সকল কাজে স্মরণিকা প্রকাশ উপকমিটির সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ এ দেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হামিদুর রহমান খান

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ হামিদুর রহমান খান
অতিরিক্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অভিজিৎ রায়
উপসচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মোঃ শামছুদ্দোহা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা

সায়কা বিনতে আলম
নির্বাহী স্থপতি
স্থাপত্য অধিদপ্তর

মোঃ নাফিজুর রহমান
প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

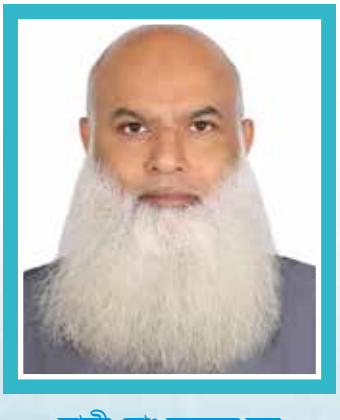

কাজী মোঃ ফজলুল হক
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

পার্থ সাহা
সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শরীফ আহমেদ এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

কাজী ওয়াছি উদ্দিন
সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পাদক

মোঃ হামিদুর রহমান খান
অতিরিক্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
- ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
- ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশন অব প্ল্যানার্স

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সায়কা বিনতে আলম
নির্বাহী স্থপতি
স্থাপত্য অধিদপ্তর

প্রকাশনা

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

০২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
১৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স লিমিটেড
ফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮২৭৫, ০১৯১৯ ০৩১৯১৭
ই-মেইল: principalbd@gmail.com

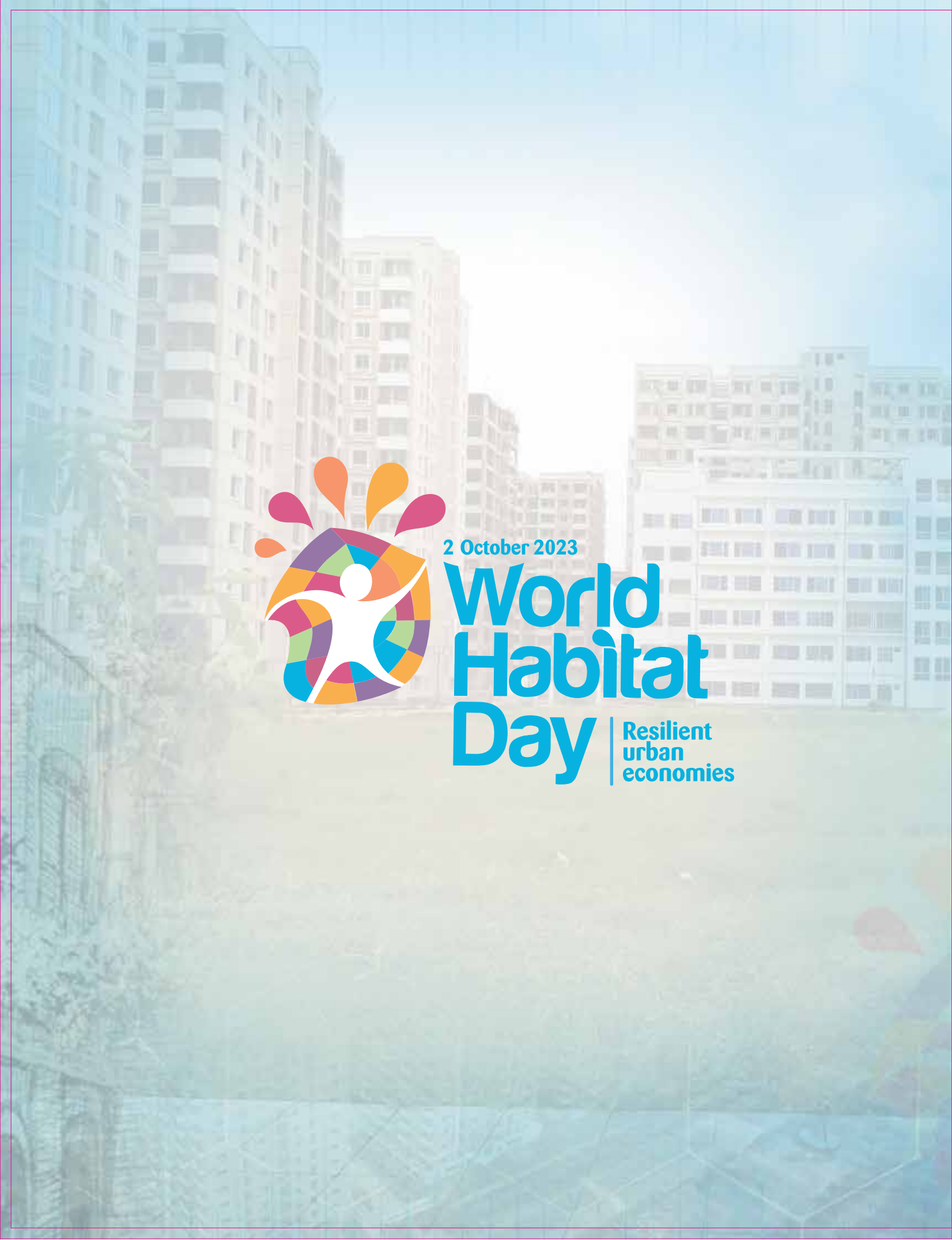
2 October 2023
World Habitat Day
Resilient urban economies

সূচিপত্র

১	পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নে রাজউক মো: আনিছুর রহমান মিঞা, পিএএ	২৩-২৪
২	Role of PWD in Sustainable Urbanization and Future Planning in Construction Materials (AAC) Mohammad Shamim Akhter	২৫-২৮
৩	Building Resilient Urban Economies: HBRI's Impact And Innovations Md. Ashraful Alam, Nahid Ferdous Dristy	২৯-৩২
৪	Clean Air for Resilient Urban Economies: Enhancing Prosperity through Environmental Responsibility Professor Dr. Ahmad Kamruzzaman Majumder	৩৩-৩৬
৫	প্রাচীন পৃথিবীর মাঝে আগামী সভ্যতার বাতিঘর নায়লা আহমেদ	৩৭-৪০
৬	ফটোগ্যালারি-১	৪১-৪৮
৭	Significance of Electromechanical Works In Promoting Sustainable Cities Shekhar Chandra Biswas	৪৯-৫২
৮	বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও স্থিতিশীল নগর অর্থনীতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান এবং স্বনির্ভর নির্মাণ উপকরণ শিল্পের ভূমিকা মো. নাফিজুর রহমান, মনজুর পারভেজ	৫৩-৫৫
৯	Structural Regularity in Building Design: Enhancing Resilience in the City for Disaster Risk Reduction Dr. Mohammad Sharfuddin, Sawgat Ahmed Shuvo	৫৬-৫৮
১০	Role of PWD for Ensuring Sustainable Cities and Resilient Urban Economics in Bangladesh SK ToufiqurRahman, Md. Kamruzzaman, Md. ShafiqurRahman	৫৯-৬১

১২ স্মার্ট সিটি বিনির্মাণে বাঁধা : ঢাকার অগ্নিদুর্ঘটনা
আকিব রায়হান, মালিহা হক ৬২-৬৪

১৩ Resilient Urban Economy through Industrial Symbiosis:A Special Focus on Dhaka City
Zannatul FerdousTithi, Rihana Parvin, Nipa and Nishat, Tasnim Sumaya ৬৫-৭২

১৪ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় আবাসন ও পরিবেশ ভাবনা
মোহাম্মদ নূর হোসেন খাঁন ৭৩-৭৪

১৫ জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য স্মার্ট নগরায়ন ও আবাসন
এ কে এম এ হামিদ ৭৫-৭৮

১৬ বাংলাদেশের শহরগুলির বৃদ্ধির ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ
শাহীন আহম্মেদ ৭৯-৮২

১৭ ফটোগ্যালারি-২ ৮৩-৯৬

১৮ স্থিতিশীল নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব
মো. সিরাজুল ইসলাম ৯৭-৯৯

১৯ Unveiling the Trajectory of Dhaka's Waste Generation and Carbon Credit Revenue Evolution towards sustainable economy
Dr. ANM Safiqul Alam Shaheen1 ১০০-১০৩

২০ কনস্ট্রাকশন ডিমোলিশন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট
সাবরিন সুলতানা, মোঃ জাহিদ শাহ সুজা ১০৪-১০৭

২১ Dhaka's Informal Economy: An In-depth Study
S M Sium1 ১০৮-১১১

২২ ফটোগ্যালারি-৩ ১১২-১২০

২৩ অগ্নিঝুঁকি ও অর্থনৈতিক সহনশীলতা: ঢাকা নগরীর উপর একটি সমীক্ষা
নম্রতা দাস, ফাতেমা তুজ জোহরা ও মো. জাহিদ হাসান ১২১-১২৮

২৪ ফটোগ্যালারি-৩ ১২৯-১৩৬

২৫ বিশ্ব বসতি দিবস-২০২৩, উদ্‌যাপন কমিটি ১৩৭-১৪০

পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নে রাজউক

মো: আনিছুর রহমান মিঞা, পিএএ[১]

মানুষ সামাজিক জীব। সুপ্রাচীনকাল হতেই অন্ন জোগাড় করে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মরক্ষার্থে একস্থান হতে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছে। বীজ বপন করে ফসল ফলানোর প্রক্রিয়া রপ্ত করার পরই মানুষ ছোটাছুটি বন্ধ করে একস্থানে বসবাস করতে শিখে। একইভাবে পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসতি গড়ে তোলে। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন থেকেই বসতির সৃষ্টি।

সকলের জন্য উপযুক্ত আবাসন নিশ্চিতকরণ ও সে সম্পর্কে গণসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে UN-Habitat কর্তৃক ঘোষিত "বিশ্ব বসতি দিবস" প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। বসতি দিবস ২০২৩-এর এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Resilient urban economics. Cities as drivers of growth and recovery'.

মানব বসতির ইতিহাস

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মাঝে অন্যতম সিন্ধু সভ্যতা যা ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতার একটি নিদর্শন। সিন্ধু-সভ্যতা মূলত ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। আধুনিক নগর পরিকল্পনার ধারণা মূলত সিন্ধু সভ্যতা থেকেই প্রাপ্ত। পৃথিবীর অন্যতম রহস্যাবৃত খেমার সভ্যতা 'অ্যাঙ্কর' সভ্যতা নামেও পরিচিত। খেমার সভ্যতার কেন্দ্র ছিল 'অ্যাঙ্কর' নামের একটি শহর, 'অ্যাঙ্কর' সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'শহর'। এছাড়াও মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, ইনকা সভ্যতা প্রভৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মানববসতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশে মানববসতির ইতিহাস

বাংলাদেশে মানববসতি, আদিমানব বসতির স্থানগুলো, যেমন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা, মেসোপটেমিয়া ও মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িক নয়। আদিকালে এই স্থানগুলো মরুময় অঞ্চল ছিল এবং নদী তীরবর্তী হলেও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল না। ঐতিহাসিকগণের ধারণা বাংলাদেশে নব্যপ্রস্তর যুগের শেষদিক থেকেই এদেশে চাষবাস আরম্ভ হয় এবং জনবসতির বিস্তার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১০০০ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশের উত্তরপশ্চিমাংশে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্বে, বর্তমানের বাংলাদেশ গঠনকারী এলাকাসমূহসহ বঙ্গীয় অববাহিকায় বহুসংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস করে আসছিল। আর্যরা গাঙ্গেয় অববাহিকার উজান অঞ্চল দখল করে বসবাস করতে শুরু করে এবং এ অঞ্চলের একটি জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে তারা এসেছিল, যাদেরকে তারা নাম দিয়েছিলো 'নিশাদাস', যার অর্থ বন্য মানুষ। সম্ভবত এরাই ছিল বর্তমানের বাংলাদেশ গঠনকারী অঞ্চলের আদি অধিবাসী। এরা ছিল এই উপমহাদেশের দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ বা উপদল যাদের অধিকাংশই বাংলার পার্বত্য অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিলো।

ঢাকায় বসতির উদ্ভব ও বিকাশ

ঢাকায় প্রাচীন আমল থেকেই ইট-পাথরের দালানকোঠার চল শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব দালানকোঠার বেশিরভাগই ছিল রাজ-রাজরাদের সিংসহাসন, আবাসস্থল ও দুর্গ। তবে সাধারণেরও সংযোগ ছিল ইটনির্মিত উপাসনালয়ে। মন্দির, মসজিদ কিংবা চার্চ। তবে আবাসন হিসেবে প্রাচীন আমলে সাধারণের হাতে গড়া তেমন কোনো পাকা বাড়ির নিদর্শন পাওয়া যায় না। মোগল আমলে কিংবা ব্রিটিশ আমলজুড়ে অবশ্য কিছু বণিক ব্যবসায়ী এখানে পাকা ইটের ঘর করেছিল। প্রাক-মোগল আমলের ঢাকার পাশের বিক্রমপুর ও তের শতকের শেষার্ধে ঢাকার আরেক পাশের সোনারগাঁও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ফলে সে সময় ওই অঞ্চলের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপত্য এবং স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়ন হয়। বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে বাবুবাজারের পূর্বে, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে প্রাক-মোগল ঢাকা। বুড়িগঙ্গার প্রবাহ বরাবর নগরের দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে বসতি গড়ে উঠেছিল। এরপর ১০০ বছরের মধ্যে এই ঢাকা একটি ছোট নগর বসতি থেকে মহানগরে পরিণত হয়। এ সময় পর্যন্ত ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা উপভোগ করে। মোগলরা এই নতুন ঢাকা আর পুরান ঢাকা এক করে নিয়ে পুরো ঢাকাকে নিজেদের মতে করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। আজও এই পুরান ঢাকা নগরটি সুস্পষ্টভাবেই মোগল শহরের ছাপ বহন করে।

---

[১]চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রাজউক ও পরিকল্পনা

দ্যা টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৩ মোতাবেক ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে রাজউক নামকরণ করা হয়। এই অ্যাক্টের আওতায় ১৯৫৯ সালে ৩২০ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী ঢাকা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও এলাকা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন প্ল্যান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৮৭ সালে ঢাকা শহরের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করে ৫৯০ বর্গমাইল (১৫২৮ বর্গ কি. মি.) করা হয় এবং ১৯৯৫ সালে উক্ত এলাকাব্যাপী ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (১৯৯৫–২০১৫) প্রণয়ন করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে প্রণয়ন করা হয়েছে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১০–২০১৫), খসড়া ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৬–২০৩৫), ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬–৩৫)-সহ অন্যান্য মহাপরিকল্পনাসমূহ টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকা। দ্রুত নগরায়ন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আবাসনের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে। তৎকালীন ডিআইটি বর্তমানে রাজউক ষাটের দশক হতে অদ্যাবধি রাজধানীতে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রম ও পেশাজীবী মানুষের আবাসন ও ব্যবসার সুবিধার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসেছে, গড়ে তুলেছে একের পর এক আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প এলাকা। রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোতে আধুনিক নগরীর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবার জন্য নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যে আবাসন যোগানে রাজউক নিম্ন ও নিম্নমধ্য আয়ের এপার্টমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের মাধ্যমে রাজউক ঢাকা মহানগরীতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন, জলাধার নির্মাণ, পার্ক ও খেলার মাঠসহ একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রশমিত করে বিভিন্ন এলাকায় সুষম উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মেট্রোপলিটন এলাকাকে একটি বাসযোগ্য এবং কার্যকরী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে এ বছর রাজউক কর্তৃক প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা' ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০২২–২০৩৫) চূড়ান্ত করা হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে স্মার্ট ও উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে রাজধানী শহরের জন্য সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কৌশলের সমন্বয়েই বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি)-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজউক বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর ভবনসমূহের দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই কাঠামো নিশ্চিতকল্পে ঝুঁকি-সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং নিরাপদ নির্মাণ অনুশীলন-এর কার্যক্রম শুরু করেছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থাপনা, পুলিশ স্টেশন, ফায়ার স্টেশন, সিটি হল এবং সরকারি ভবনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নির্মাণমান ও দূর্যোগ এর ঝুঁকি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ পরিচালিত করছে। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ, সাশ্রয়ী আবাসন উন্নয়ন, ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ উন্নয়নসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং তা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে।

উপসংহার

ঢাকা মহানগরীকে একটি সুপরিকল্পিত, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগরী হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে রাজউক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা নগরীর উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল সংস্থার সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগও এক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজন। এছাড়া রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সময়োপযোগী আইন ও বিধি প্রণয়নে রাজউক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে একটি স্মার্ট মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

Role of PWD in Sustainable Urbanization and Future Planning in Construction Materials (AAC)

Mohammad Shamim Akhter[1]

2023 has been a particularly challenging year for Urban Economies. The Russia-Ukraine war has brought new challenges to the economy even before the global economic recession caused by the Covid-19 pandemic has been overcome. All over the world inflation rate is becoming higher in many countries due to facing various challenges including rising oil prices, dollar crisis, import crisis, food shortage. For this reason the cost of living has increased and employment has decreased at a significant rate in many countries. As a result urban economies are being disrupted. In this global context the theme of the World Habitat Day 2023 has been set as "Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recovery".

To deal with the existing economic crisis, in the light of the theme of World Habitat Day and considering the context of Bangladesh, special emphasis needs to be placed on sustainable urbanization.The main goal of sustainable city or green city planning is to reduce carbon emissions, waste, air pollution and water pollution. Besides this saving energy and waste management are some of the goals of sustainable urbanization as well. PWD is working to build sustainable cities keeping these issues in mind.

Activities of PWD in sustainable urbanization

PWD is the pioneer in the construction area of Bangladesh. PWD has made significant changes in the construction of government buildings with the aim of building a sustainable city. Some of this are-

a. Use of non-fired blocks almost in all buildings to reduce carbon emissions and air pollution;
b. Installation of solar panel and rain water harvesting system in all buildings for use of renewable energy;
c. Setting up sewage treatment plant (STP) for waste management and reuse of treated water in car wash, gardening, flushing system in toilet which will contribute to reduce water & air pollution;
d. Use of censored light, automatic motors to save electricity. Use of censored water taps, dual flushing system to save water.

Use of non-fired bricks in all projects to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) and to reduce carbon emissions for sustainable urbanization

Several initiatives have been taken by PWD to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), especially the Goal 11 (make cities and human settlements inclusive safe and resilient). For sustainable urbanization, eco-friendly construction materials are used in all the projects implemented by PWD.

[1]Chief Engineer, PWD

Every year one percent of soil is used for brick production in Bangladesh.58% of air pollution in Dhaka and its surroundings is due to the nearby brick kilns. Therefore environment friendly non-fired blocks (such as concrete solid bricks, concrete hollow bricks autoclaved aerated concrete blocks) are being used instead of burnt bricks in almost all the projects under implementation by PWD to protect environment and agricultural land. Autoclaved Aerated Concrete (AAC) is widely used in construction works all over the world, especially in developed countries.

Concept of Autoclaved aerated concrete (AAC) and its utility

Autoclaved Aerated Concrete (AAC) is a lightweight, precast, cellular concrete building material, eco-friendly, suitable for producing concrete-like blocks, wall panels, floor and roof panels, cladding (façade) panels and lintels. It is composed of sand, calcined gypsum, lime, cement, water and aluminium or paste. AAC products are cured under heat and pressure in an autoclave.

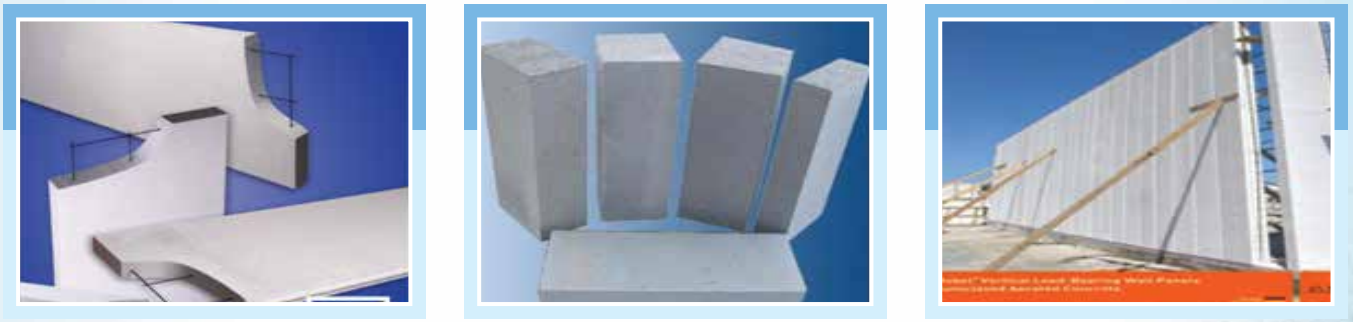

Image 1: Autoclaved Aerated Concrete (AAC)

When AAC is mixed and cast in forms, several chemical reactions take place that give AAC its light weight (20% of the weight of concrete) and thermal properties. Aluminum powder reacts with calcium hydroxide and water to form hydrogen. The hydrogen gas foams and doubles the volume of the raw mix creating gas bubbles up to 3 millimetres (1⁄8 in) in diameter. At the end of the foaming process, the hydrogen escapes into the atmosphere and is replaced by air. When the forms are removed from the material, it is solid but still soft. It is then cut into either blocks or panels and placed in an autoclave chamber for 8 -12 hours. During this steam pressure hardening process, when the temperature reaches180 - 190 °C and the pressure reaches 800 to 1,200 kPa (8.0 to 12.0 bar; 120 to 170 psi), sand reacts with calcium hydroxide to form calcium silicate hydrate, which gives AAC its high strength and other unique properties.

In our country burnt clay brick or fire-brick is the highest used building material till now. This is not only destroying our environment but also reducing the arable land by using top soil.

AAC blocks are light weight & can be the best replacement of fire-brick. These blocks of different densities & sizes can be used in construction of very small to very big buildings including meeting the requirement of insulation for sound proofing, fire resistance, energy saving etc. AAC has the highest fire resistance rating of all building materials. The vulnerability to destruction by earth-quake is much lower due to its light weight.

High speed construction of buildings with minimal labor cost can be achieved with AAC Wall panels, Floor panels & roof panels. In comparison with fire-brick it will also be cheaper.

AAC has several advantages over other cement construction materials, one of the most important being its lower environmental impact.

Image 2: Use of AAC in Residential House

Image 3: Use of AAC in High Rise Building

- Improved thermal efficiency reduces the heating and cooling load in buildings. High energy saving.
- Porous structure gives superior fire resistance. AAC has one of the highest hourly fire-resistance ratings per inch of any building material. A 4 AAC wall carries a 4-hour (UL) rating. AAC is non-combustible AAC units offer excellent fire protection for fire- rated walls, stairwells, columns, beams, corridors and shaft walls.
- Workability allows accurate cutting, which minimizes the generation of solid waste during use.
- Eco-friendly in nature not producing pollution in the environment and contributes to LEED rating green building material.
- Resource efficiency gives it lower environmental impact in all phases from the processing of raw materials to the ultimate disposal of waste.
- Being lighter in weight the blocks can be handled easily. The lighter weight saves cost and energy in transportation, labour expenses, and increases chances of survival during seismic activity.
- Larger size blocks & panels lead to faster masonry work.
- Reduces project cost.
- Good ventilation: This material is very airy and allows the diffusion of water, reducing humidity inside the building. AAC absorbs moisture and releases humidity, helping to prevent condensation and other problems related to mildew.
- Non-toxic: There are no toxic gases or other toxic substances in autoclaved aerated concrete. It does not attract rodents or other pests, and cannot be damaged by them.
- Accuracy: Panels and blocks made of autoclaved aerated concrete are produced to the exact sizes needed

before leaving the factory. There is less need for on-site trimming. Since the blocks and panels fit so well together, there is less use of finishing materials such as mortar.

- Long-lasting: The life of this material is longer because it is not affected by harsh climates or extreme weather changes, and will not degrade under normal climate changes.

Considering the advantages, compliances & ongoing increasing demand of construction of buildings in our country we should move to AAC. Sand is abundant in our country & it is the main raw material & it is about 65-70% of AAC. Since it is light weight the material cost will be lower for AAC than other similar building materials. The requirement of reinforcement will be lower. Consequently the construction cost will also be lower than that with conventional firebricks & solid concrete.

Only one or two AAC production plants with capacities 500-1000m3/day has been set up in our country very recently. A few AAC plants is going to be set up shortly. There is still a very big vacuum for substantial replacement of fire brick with AAC blocks & panels. People with the knowledge of the advantages of using AAC have started using AAC in their construction work. But most of the rural people are not aware of AAC and in some cases they even don't know the environmental impact & disadvantages of using fire bricks. So an awareness program should be thrown in different ways to educate the people & make them aware in this regards.

It is easy to predict that Autoclaved Aerated Concrete (AAC) will make a breakthrough in the construction sector of Bangladesh in future.And in this regard as always, with the aim of setting an exemplary example, the Public Works Department continues to plan for setting up AAC plants. On December 12, 2022 Honorable Prime Minister Sheikh Hasina asserted that the Bangladesh of 2041 will be a smart Bangladesh. She also said the government has fixed four bases – smart citizens, smart economy, smart government and smart society– to make the country 'Smart Bangladesh'. Echoing the dream of the Hon'ble Prime Minister, PWD is committed to building a sustainable, smart city by introducing new technologies in the field of construction.

Building Resilient Urban Economies: HBRI's Impact And Innovations

Md. Ashraful Alam[1], Nahid Ferdous Dristy[2]

Introduction

Urbanization, characterized by the migration of populations from rural to urban areas, has become a defining trend of the 21st century. According to the United Nations, cities are home to 55% of the global population, projected to reach 68% by 2050[1].While pulsating with opportunities and economic vigor, these urban areas face challenges ranging from infrastructural pressures to environmental vulnerabilities. For countries like Bangladesh, rapid urbanization is accompanied by the dual challenges of environmental threats and the urgent need for sustainable development. Building resilient urban economies that can absorb shocks, adapt, and thrive amidst adversities has emerged as an imperative in this intricate landscape. This paper will delve into the concept of resilient urban economies, particularly in the context of Bangladesh, and spotlight the role played by the Housing and Building Research Institute (HBRI) in nurturing urban resilience synergized with sustainable growth.

The Nexus of Urbanization and Economic Resilience

Urban areas have long been recognized as engines of economic growth. According to the World Bank, cities contribute nearly 80% of the global GDP[2]. Urban centers like Dhaka and Chittagong in Bangladesh have increasingly become hubs for industries, businesses, and innovation, significantly driving national economic development[3]. Urbanization is a double-edged sword, offering economic opportunities on the one hand while presenting vulnerabilities on the other. Let us dissect this interplay:

a. Urban Centers as Economic Powerhouses

The ascendancy of cities as epicenters of economic activity is a globally acknowledged trend. Cities offer a concentration of human capital, fostering innovation and collaboration. In Bangladesh, the transformative potential of urban areas is evident in hubs like Dhaka and Chittagong.

Economic Diversification : Beyond the dominant garment industry, which is a significant contributor to the country's GDP[4], cities in Bangladesh have witnessed a proliferation of IT services, finance, real estate, and tourism sectors. This diversification is critical for resilience, ensuring that economic downturns in one sector do not devastate the entire urban economy.

Innovation and Start-up Culture : Urban centers in Bangladesh have become hotbeds for start-ups and innovation, with increased access to digital technologies, venture capital, and a young, tech-savvy population seeking entrepreneurial avenues[5].

---

[1]Director General, HBRI. [2]Research Architect, HBRI

b. The Shadow of Vulnerabilities

While urban centers are bustling with opportunities, they also grapple with challenges that can undermine their economic promise.

Natural Disasters: Being Located in the deltaic region, Bangladesh is inherently vulnerable to hydro-meteorological threats like cyclones, floods, and river erosion. With its high population densities, cities become high-risk zones during such events.

Infrastructure Deficit: Many cities in Bangladesh have expanded rapidly without commensurate infrastructural growth. This leads to issues like waterlogging, traffic congestion, and inadequate waste management, all of which can hamper economic activities and diminish the quality of urban life.

Social Challenges: Rapid urbanization often leads to the mushrooming of informal settlements, or slums. These areas, marked by poverty, poor sanitation, and limited access to services, can become areas of socio-economic vulnerability, affecting broader urban resilience.

Economic Disparities : While cities generate wealth, they can also accentuate economic disparities. It's vital that the fruits of urban growth are equitably distributed to ensure social stability and cohesion, which are foundational to economic resilience.

Building Resilient Urban Economies : HBRI's multidimensional approach in achieving resilient urban economies requires a holistic and integrative approach. In Bangladesh, the Housing and Building Research Institute (HBRI) has championed a series of initiatives that exemplify this integrated strategy :

a. **Research and Innovation :** The transition towards resilient urban economies necessitates continuous innovation in construction materials and methods. HBRI's commendable research on sustainable construction technology and alternative materials such as sand cement solid block, sand cement hollow block, thermal block, non-fired solidification block, compressed stabilized earth block (CSEB), interlocking block, AAC block, (Fig 1) etc. have paved the way for reduced carbon footprints, thus integrating economic growth with environmental consciousness.

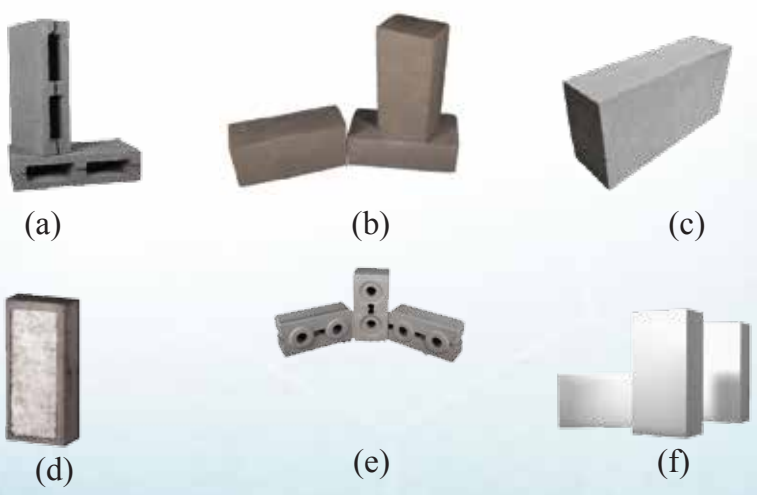

Fig 1: (a) Sand Cement hollow block, (b) CSEB (c) Sand Cement solid block, (d) Thermal block, (e) Interlocking block, (f) AAC block.

b. **Building Codes and Standards :** Ensuring resilience in urban infrastructure is imperative. Through rigorous building codes and standards, HBRI ensures that urban expansion in Bangladesh adheres to globally recognized best practices in resilience and safety. Since HBRI is the custodian authority of Bangladesh National Building Code (BNBC) therefore, HBRI is regularly updating the code in order to establish minimum standards for design, construction, quality of materials, use and occupancy, location and maintenance of all buildings within Bangladesh in order to safeguard life, limb, health, property and public welfare.

Fig 2: Bangladesh National Building Code (BNBC)

c. **Capacity Building :** A resilient urban economy stands on the foundation of a skilled workforce. Through workshops like "Nijer bari nijei kori", “Training program to create skilled workers” (Fig 3), HBRI is capacitating local constructors and stakeholders, ensuring that modern construction practices permeate all community levels. Besides, HBRI is also providing internship programs on technical sector to the students of Polytechnique and other such institutes.

Fig 3: Training Program for Construction Workers

d. **Disaster Preparedness :** Equipping cities to handle calamities is synonymous with safeguarding their economies. HBRI's thrust on disaster preparedness ensures minimal disruption to urban economic activities, even in the face of challenges. Recently, HBRI has accomplished a Bangladesh-Japan joint venture project titled “SATREPS-TSUIB” (2016-2022) whose main objective was to find a complete set of tools and techniques appropriate Bangladesh for seismic assessment and retrofitting of existing vulnerable buildings. As an outcome of the project 5 manuals have been developed (Fig 4). This was also intended to help us prepare urban planning strategies that can make our cities resilient against probable disasters triggered by earthquakes.

Fig 4: Outcomes of TSUIB project: 5 manuals or guidebooks.

e. **Community Engagement:** Building resilience is a collective endeavor. HBRI ensures that resilience strategies resonate with the people they protect by emphasizing community involvement.

f. **Policy Advocacy:** Crafting a resilient urban economy necessitates a supportive policy backdrop. Through

its advocacy, HBRI is instrumental in bringing resilience to the forefront of Bangladesh's urban development policies.

Conclusion

World Habitat Day 2023's emphasis on resilient urban economies illuminates a critical facet of sustainable development. Cities, in their vibrancy and potential are undoubtedly the mainstay of economic progress, and as Bangladesh's urban landscape burgeons, the call for resilient urban economies becomes ever more poignant. Urban resilience is not just about withstanding natural calamities. It is equally about safeguarding and nurturing the economic vitality of urban areas. Cities fortified against natural disasters yet marred by economic inequities or infrastructural bottlenecks can hardly be deemed resilient. True resilience weaves together the socio-economic fabric of urban societies, ensuring that cities are places of equitable growth, innovation, and prosperity.In this light, the role of institutions like HBRI becomes pivotal. Through its multifaceted initiatives, ranging from innovative research to community engagement, HBRI has underscored its commitment to holistic urban resilience. HBRI's endeavors echo the essence of World Habitat Day, focusing not just on structures but on the very soul of cities—their people.

As we envision the future of urban Bangladesh, it is imperative to embed resilience in every facet of urban planning and development. This includes:

Proactive Planning : The need for preemptive strategies that anticipate challenges and incorporate resilience from the outset.

Stakeholder Collaboration : Bringing together policymakers, businesses, community leaders, and citizens to co-create resilient urban futures.

Continuous Innovation : Adapting to the dynamic nature of cities, spurred by technological advancements and changing socio-economic landscapes HBRI in a continuous process of innovation.

With HBRI at the forefront of these endeavors, Bangladesh is not just responding to the imperatives of urban resilience but is also shaping a blueprint for other nations grappling with similar challenges. As the momentum towards World Habitat Day 2023 amplifies, let us remember that resilient urban economies are not mere destinations but continuous journeys requiring unwavering commitment, collective action, and an undying spirit of innovation.

References

[1] "UNITED NATIONS," 2018. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

[2] "THE WORLD BANK." https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/urbanization-south-asia-cities

[3] N. Banks, Urban Poverty in Bangladesh: Causes, Consequences and Coping Strategies, no. May. 2012. doi: 10.2139/ssrn.2166863.

[4] B. M. Sajjad Hossain, B. Sajjad Hossain, M. Ashif Noor, M. Aktaruzzaman Khan, and M. Elmur Reza, "The contribution of garments industry in Bangladesh economy," Int. J. Adv. Sci. Res., vol. 1, no. 6, pp. 11–14, 2016, [Online]. Available: www.allscientificjournal.com

[5] A. K. Karmaker, S. M. R. Islam, M. Kamruzzaman, M. M. U. Rashid, M. O. Faruque, and M. A. Hossain, "Smart City Transformation: An Analysis of Dhaka and Its Challenges and Opportunities," Smart Cities, vol. 6, no. 2, pp. 1087–1108, 2023, doi: 10.3390/smartcities6020052.

Clean Air for Resilient Urban Economies: Enhancing Prosperity through Environmental Responsibility

Professor Dr. Ahmad Kamruzzaman Majumder

1.1. Introduction

Clean air is an indispensable component for nurturing resilient urban economies in Dhaka, Bangladesh. As one of the world's most densely populated cities, Dhaka faces severe air quality challenges due to rapid urbanization, industrial growth, and heavy traffic congestion. Tackling air pollution is not just an environmental concern but a fundamental economic imperative. Poor air quality adversely impacts workforce productivity, leading to increased healthcare costs and hindering economic growth. In Dhaka, where attracting talent and foreign investments is crucial, clean air serves as a magnet for skilled professionals and businesses. It fosters a conducive environment for industries to thrive, enhances the city's competitiveness, and contributes to a sustainable urban economy. By implementing effective air quality regulations, investing in sustainable transportation, and promoting green urban planning, Dhaka's local government can catalyze clean air initiatives that are not only vital for the health and well-being of its residents but also instrumental in fortifying the city's economic resilience and long-term prosperity.

1.2. The Nexus of Clean Air and Urban Economic Resilience

Economic Productivity and Human Capital

In Bangladesh, where urbanization is occurring at a rapid pace, clean air is increasingly essential for economic productivity. Dhaka, the capital and largest city, faces significant air quality challenges due to a high population density, rapid industrialization, and traffic congestion. In 2021, Dhaka was ranked as one of the most polluted cities globally, with a PM2.5 concentration exceeding the World Health Organization's (WHO) recommended limits. This dire air quality has a tangible impact on the workforce, leading to higher absenteeism and reduced productivity.

Moreover, attracting and retaining talent in Dhaka is a critical concern for economic growth. The city's air pollution issues have led to concerns about the quality of life, impacting its ability to draw skilled professionals and international investments. Addressing air quality is pivotal for Dhaka to compete effectively in the global talent market.

Reducing Healthcare Costs

Air pollution in Dhaka is also associated with significant healthcare costs. The economic burden of

Chairman, Department of Environmental Science, Dean, Faculty of Science, Stamford University Bangladesh
Chairman, Center for Atmospheric Pollution Studies (CAPS) & Joint Secretary, Bangladesh PoribeshAndolon (BAPA)

pollution-related illnesses, including respiratory diseases and cardiovascular problems, weighs heavily on Bangladesh's healthcare system. As healthcare resources are diverted towards treating pollution-related illnesses, Dhaka's healthcare system is strained, potentially affecting its overall economic development.

1.3. Clean Air as an Engine of Economic Growth

Investment Attraction and Business Competitiveness

Clean air initiatives can significantly impact Dhaka's ability to attract investments and enhance business competitiveness. As investors increasingly prioritize sustainability and corporate social responsibility, they are drawn to cities that demonstrate a commitment to clean air and environmental stewardship. Clean air can make Dhaka a more attractive location for businesses, leading to increased foreign direct investment (FDI) and job creation.

Innovation and Technological Advancements

While Dhaka faces substantial air quality challenges, it also presents opportunities for innovation and technological advancements. Embracing clean technologies and sustainable urban planning can not only address air pollution but also drive economic growth. Initiatives that promote green technologies and sustainable practices can foster innovation hubs within the city, generating new economic opportunities.

1.4. Environmental Sustainability and Economic Stability

Beyond Economic Growth: The Imperative of Sustainable Development

For Dhaka and Bangladesh as a whole, sustainable development is a pressing need. The country is susceptible to the impacts of climate change, and poor air quality exacerbates these challenges. Investing in clean air measures contributes to the city's resilience against environmental risks and climate change, aligning with Bangladesh's broader sustainability goals.

Urban Green Spaces and Economic Value

Dhaka's urban planning can benefit from incorporating green spaces and sustainable infrastructure. Not only do these initiatives improve air quality, but they also enhance property values and tourism potential. As Dhaka strives for economic stability, green urban planning can provide an additional source of economic value.

1.5. Regulatory Measures and Collaborative Efforts

Strengthening Air Quality Regulations

In Bangladesh, strengthening air quality regulations is crucial to address the pressing issue of air pollution in Dhaka. Implementing and enforcing emissions standards for industries and transportation can help reduce pollutant emissions. Additionally, rigorous enforcement mechanisms are necessary to ensure compliance with these regulations.

Inter-City and Regional Collaboration

Air pollution in Dhaka often extends beyond city boundaries, necessitating regional collaboration. Bangladesh can collaborate with neighboring countries on transboundary air pollution issues. Regional agreements and partnerships can help create a comprehensive approach to addressing air quality challenges in Dhaka.

1.6. Technological Solutions and Public Awareness

Technological Innovations for Real-time Air Quality Monitoring

In Dhaka, technological innovations for real-time air quality monitoring are critical. This approach provides policymakers and the public with timely and accurate data to inform policies and take preventive measures. Real-time monitoring can be instrumental in addressing Dhaka's air quality crisis.

Public Education and Behavioral Change

Raising public awareness in Dhaka about the importance of clean air is essential. Engaging communities in Dhaka in environmental stewardship can lead to behavioral changes that reduce pollution. Empowering Dhaka's residents with knowledge and encouraging collective responsibility are vital steps toward improving air quality.

1.7. Case Studies: Exemplary Cities Leading the Way

Beijing, China: Transforming Air Quality through Policy and Technology

While not directly comparable to Dhaka, Beijing's experience with air quality improvement provides valuable insights. Through stringent policies, investment in clean technologies, and public awareness campaigns, Beijing has made significant progress in addressing air pollution. Dhaka can draw inspiration from Beijing's success in tackling air quality issues.

London, United Kingdom: Urban Green Initiatives for Clean Air and Economic Growth

London's green initiatives have not only improved air quality but also boosted economic growth. Dhaka can learn from London's experience in leveraging urban green spaces to enhance property values and tourism, contributing to economic prosperity.

1.8. The role of local government in reducing air pollution

The role of local government in reducing air pollution is paramount, as it plays a crucial part in implementing policies, regulations, and initiatives that directly impact the quality of air within a specific municipality or region. Here are some key responsibilities and actions that local governments can take to mitigate air pollution:

i. Developing and Enforcing Air Quality Regulations:

- Local governments can establish and enforce air quality regulations tailored to the unique challenges of their region. This may include emissions standards for industries, transportation, and construction activities.
- They can monitor compliance with these regulations and impose penalties for violations to ensure that businesses and individuals adhere to clean air standards.

ii. Promoting Sustainable Transportation :

- Local governments can invest in public transportation infrastructure and promote the use of electric vehicles, bicycles, and walking as alternatives to private car use.
- Implementing policies such as congestion pricing, carpool lanes, and promoting ride-sharing can help reduce traffic-related emissions.

iii. Encouraging Green Building Practices :

- Local governments can incentivize green building practices, including energy-efficient designs and the use of sustainable materials.
- They can establish building codes and standards that promote energy efficiency and reduced emissions from buildings.

iv. Supporting Renewable Energy Initiatives :

- Local governments can facilitate the transition to clean energy sources by promoting solar, wind, and other renewable energy installations within their jurisdiction.

- Offering incentives and streamlining permitting processes for renewable energy projects can encourage their adoption.

v. Urban Planning and Green Spaces :

- Incorporating green spaces, parks, and urban forests into urban planning can help absorb pollutants and improve air quality.
- Promoting mixed-use development and reducing urban sprawl can lead to more sustainable transportation patterns and reduced air pollution.

vi. Waste Management and Recycling :

- Efficient waste management practices, including recycling and waste-to-energy facilities, can help reduce emissions from landfills.
- Local governments can also promote waste reduction and recycling programs to minimize the generation of pollutants.

vii. Public Awareness and Education:

- Local governments can play a vital role in raising public awareness about the health and environmental impacts of air pollution.
- Public education campaigns can encourage individuals and businesses to adopt practices that reduce emissions.

viii. Monitoring and Data Collection:

- Establishing air quality monitoring networks and sharing real-time air quality data with the public can promote transparency and help residents make informed decisions about outdoor activities during times of poor air quality.

ix. Supporting Research and Innovation:

- Local governments can fund and support research initiatives that focus on air quality improvement and the development of innovative technologies to reduce pollution.
- Partnering with local universities and research institutions can foster a culture of innovation and knowledge exchange.

x. Collaboration with Regional and National Authorities:

- Collaborating with regional and national authorities is essential, as air pollution often transcends local boundaries. Local governments can participate in regional efforts to address pollution sources that affect multiple jurisdictions.

1.9. Conclusion

In Bangladesh, particularly in Dhaka, clean air is not merely an environmental aspiration; it is a linchpin of urban economic resilience. As Dhaka grapples with rapid urbanization, industrialization, and population growth, recognizing the symbiotic relationship between clean air and economic prosperity becomes paramount. By investing in air quality measures, Dhaka can fortify its economic foundations, entice investments, and pave the way for sustainable and resilient urban development. Local governments play a critical role in reducing air pollution by implementing policies, regulations, and initiatives that target sources of pollution within their jurisdictions. By taking proactive steps to improve air quality, they can enhance public health, attract investment, and create more livable and sustainable communities.Addressing air pollution is an imperative that can usher in a new era of urban economic vitality and environmental stewardship, positioning Dhaka as a thriving, competitive, and sustainable global city.

প্রাচীন পৃথিবীর মাঝে আগামী সভ্যতার বাতিঘর

নায়লা আহমেদ[১]

পৃথিবীর আজকের অবস্থান অনেক সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও পতনের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন সভ্যতার অনেক কিছুই ভূমিকা রাখছে আমাদের শহরের আর ভবনের পরিকল্পনায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সংস্কৃতি, সরকার ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবধান সত্ত্বেও প্রাচীন এবং আধুনিক শহরগুলো নিজ নিজ জনসংখ্যার তুলনায় দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য চারটি নগর সভ্যতা হলো মিসরের নীল নদের তীরে মিসরীয় সভ্যতা, বর্তমান ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী উপত্যকায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চীনের পীত ও ইয়াংজি নদী উপত্যকায় প্রাচীন চীন সভ্যতা এবং বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতা। এগুলোর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবস্থান, হাজার হাজার বছরব্যাপী স্থিতিকাল, বড় বড় নগর ও স্থাপত্য নির্মাণ, কারিগরী মানের জন্য এই সভ্যতাগুলো বিখ্যাত। কিউবিট, স্প্যান, পিরামিডসহ আরও অনেক কাঠামোর উৎপত্তিস্থল ওই নীলনদের অববাহিকা। আধুনিক স্থাপত্যকলায় যার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, যার উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন ভবনের নকশায়। বিশ্ব জুড়ে অনেক ভবন পিরামিডের আদল দেখা যাবে। যেমন– মেমফিসের পিরামিড অ্যারেনা, লাস ভেগাসের লুভর ক্যাসিনো এন্ড হোটেল, জাপানের নিমা স্যান্ড মিউজিয়াম, এসব ভবন পিরামিডের আদলে নকশা করা হয়েছে। প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামের প্রবেশদ্বারও পিরামিডের মতো নির্মাণ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেভিড কারবালো বলেন, মানুষ কীভাবে কোনো জায়গায় বসতি স্থাপন করে, সে সম্পর্কে অতীত ও বর্তমানের কিছু অভিন্ন ধরন বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আধুনিক নগরগুলোর নকশার সঙ্গে প্রাচীন শহরগুলোর বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পেয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্বভাবতই অবাক হন। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং নৃতত্ত্ব, বাস্তুসংস্থানবিদ্যা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে জরিপের ফলে জানা যাচ্ছে যে, দূর অতীতে সিন্ধু সভ্যতা একটি গৌরবময় সভ্যতা ছিল যা ঐ অঞ্চলে পূর্বের সংস্কৃতি ও সমাজ থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উদ্ভূত হয়েছিল, সম্পদের তুলনামূলক সমান বণ্টনসহ সমাজে সমৃদ্ধি ছিল, বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং সমাজে ও রাষ্ট্র শাসনে এক ধরনের গণতন্ত্রের উপস্থিতি ছিল। এই বিষয়গুলো এই সভ্যতাকে প্রাচীন পৃথিবীতে অতুলনীয় সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

রাজা বা শাসকদের জমকালো রাজপ্রাসাদ আর মন্দিরের বিবেচনায় সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন মিসর বা মেসোপটেমিয়ার মতো চোখ ধাঁধানো নয়, কিন্তু আবিষ্কৃত নগরগুলি– হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারো, সুতকাজেনডোর, লোথাল, কালিবঙ্গানের অবস্থান ও নগর-পরিকল্পনা দেখে বোঝা গেছে যে, নাগরিক জীবনের নানান বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এ সভ্যতায় রয়েছে। নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মানুষেরা গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলেছিলো এবং সিন্ধু সভ্যতা ছিলো তার সমকালীন মানবসভ্যতায় একটি উন্নত সভ্যতা। কেননা এই নগরসমূহের পরিকল্পনা দেখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে সেই সভ্যতার নগরবাসী সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরায়ন করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো। সিন্ধু অঞ্চলের নগরগুলির দুটি অংশ ছিল– পশ্চিমের উঁচু দুর্গ এলাকা এবং পূর্বের নিম্নাঞ্চল। উঁচু এলাকায় নগরের দুর্গ ছিল এবং সেখানে সাধারণত সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরাই বসবাস করতো। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীতে চারদিকে দেয়াল পরিবেষ্টিত একটি করে দুর্গ নির্মিত হয়েছিল, দুর্গের চারদিকে কাদামাটি

মানচিত্রে সিন্ধু সভ্যতা [Source: Wikipedia]

[১]যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

ও কাঁচা ইট দিয়ে পুরু করে ৪০ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিলো। দুর্গের বাইরের অংশে ৪ ফুট পুরু পোড়ানো ইটের আরেকটি অতিরিক্ত দেয়াল ছিলো। চারপাশে নজরদারি করার জন্য তৈরি করা হয়েছিলো সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ ঘর। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দুর্গের ভেতরে একটি করে বিশাল শস্যাগার অবস্থিত ছিল। হরপ্পায় দুর্গের ভেতরে ৬টি শস্যাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটি শস্যাগার নদীর কাছাকাছি অবস্থিত। সম্ভবত খাদ্যশস্য নদীপথে পরিবহনের সুবিধার জন্যই শস্যাগারগুলো নদীর কাছাকাছি নির্মিত হয়েছিল। নগরীর নিচু অংশে ছিল উপ-নগরী।

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ইমেরিটাস অধ্যাপক আমান্ডা পোডানি বলেন, "সারাবিশ্বে আধুনিক জীবনের বিশদ বিবরণের অনেকগুলো উৎস রয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতিতে ফিরে যায়।" রোমানদের আগে শহর ও নগরগুলোয় যাতায়াতের সহজ কোন পথ ছিল না। কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা আর বাণিজ্য পথের গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছিল। এ কারণে সবচেয়ে ভালো পথ নির্মাণ করতে বড় আকারে জরিপ করা হয়, যাতে পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার তৈরি না হয় এবং পথটি সোজাসাপ্টা হয়। তারা পাথরের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পথের ওপরও পাথর বসিয়ে দেয়, যাতে ভারী ঘোড়ার গাড়ি এবং সৈন্য বহরের চাপেও রাস্তা ঠিকঠাক থাকে। রোমানদের তৈরি করা বেশ কিছু পথ এখনো ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সড়ক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগের এই প্রযুক্তি এখনো সড়ক নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পান পর্যায়ে সুপরিচালিত নগর-প্রাচীর ও নগর-দরজা এবং নগরের ভিতর নগর-দরজা থেকে বের হওয়া উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে বিন্যস্ত প্রধান রাস্তা নির্মাণ করার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সড়কগুলো ৯ থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া হতো। এই রাস্তায় যুক্ত হওয়ার জন্য ৫ ফুট চওড়া ছোট ছোট গলিগুলি প্রধান রাস্তার সঙ্গে সমকোণে প্রসারিত ছিল এবং বাড়িঘরগুলি রাস্তার দুই ধারে অবস্থিত ছিল। ফলে নগরের সার্বিক চেহারা দাঁড়িয়েছিল সরল সড়ক দ্বারা বেষ্টিত ছোটো ছোটো চৌকো ব্লকের সমন্বিত রূপে। সমস্ত রাস্তা ও গলিতে একটি গরু-গাড়ি বা রাস্তায় মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে সকল সন্নিহিত এলাকায় মানুষের একই রকম প্রবেশাধিকার ছিল। নগরে-দুর্গের সীমানায় শোভাযাত্রা চালনার উপযোগী রাজপথ ছিল। রাজপথ ধরে সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজে যেত। রাস্তার পাশে ছিল বাঁধানো ফুটপাত ও সমান দূরত্বে ল্যাম্পপোস্টও স্থাপন করা হয়েছিল। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা ছিলো। রোমানরা ৭০০ বছর ধরে, পুরো ইউরোপে ৫৫ হাজার মাইল রাস্তা তারা পাকা করে ফেলে। প্রতিটি রাস্তা ছিল দক্ষ প্রকৌশলীদের নকশা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বানানো। এসব রাস্তা অনেক বছর ধরে টিকে ছিল। এমনকি আজ দুই হাজার বছর পরও রোমানদের তৈরি রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। পৌত্তলিক ব্রিটেনের প্রথা আর বিশ্বাসের নানা বিষয় শহরের নকশায় ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। স্টোনহেজের মতো শহরের প্রধান সড়কটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, গ্রীষ্মের সময় সেটি উদিত সূর্যের সমান্তরাল থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক স্কট অর্টম্যানের নেতৃত্বে গবেষকেরা দুই হাজার বছরে স্থাপিত বিভিন্ন প্রাচীন শহর ও স্থাপনার প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে দেখেন। অতীত ব্রিটেন থেকে শুরু করে ব্যাবিলন, এরকম অনেক প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন নিয়ে গড়ছে উঠেছে আমাদের আধুনিক বড় বড় শহরগুলো। সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন আকৃতির বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। রাস্তার প্রান্তসীমার বাড়িঘর বৃত্তাকারে নির্মিত হতো। নগরীর বেশির ভাগ বাড়ি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিল বিশেষ করে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে। তবে লোথাল ও কালিবঙ্গানে দেখা যেত রোদে পোড়ানো ইটের বাড়ি। তিনতলা বাড়ি পর্যন্ত ছিল। এ সব বাড়ির রাস্তার দিকে দরজা এবং জানালা ছিল না। দেয়াল থাকার কারণে রাস্তার থেকে বাড়ির ভিতের অংশ দেখা যেত না। অভিজাত বাড়িগুলো বাড়ি হতো দোতলা বা তিনতলা! দেয়ালে ছোট ছোট ফোঁ াকর ছিল। প্রত্যেকটি বাড়ি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কোন কোন বাড়ি ছিলো বহুতল বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি আবাস গৃহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। বাড়িগুলিতে নানা আকারের কক্ষ, কুয়ো ও স্নানাগার থাকতো। এছাড়াও শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, প্রক্ষালন কক্ষ, গুদামঘর ইত্যাদি থাকতো। বাড়ির প্রবেশ দরজা সাধারণত সড়কমুখী হতো। বাড়ির কক্ষগুলোতে আলো বাতাস আসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো। রান্নাঘর ও স্নানাগারের ধার ঘেঁষে ড্রেন তৈরি করা হতো। এতে ধারণা করা যায় যে নগরবাসীরা বিলাসবহুল, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতো। হরপ্পায় তিন ধরনের মানুষ তিন ধরনের বাড়িতে বসবাস করতো।

১. সাধারণ বাড়ি : সমাজের সাধারণ মানুষ (সাধারণ শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষক ইত্যাদি) এই জাতীয় বাড়িতে বসবাস করতো। এই বাড়িগুলো নিতান্তই ছোট ছোট ছিল। এগুলো ছিল মূলত এক বা দুই কক্ষের বাড়ি।

২. অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি : সুপরিসর এই বাড়িগুলোতে থাকতো ধনী বণিক, সরকারি কর্মকর্তারা এবং অভিজাত শ্রেণির কিছু মানুষ। আকার পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

৩. বড় সরকারি বাড়ি : সম্ভবত উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি, প্রশাসনিক কার্যালয়।

নগরীর অধিকাংশ ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল কাদা মাটি বা অপোড়া ইট দিয়ে। বাড়ির দেয়ালে ব্যবহার করা হতো মাটির সাথে নলখাগড়া বা

কাঠের টুকরো। ইটের দেওয়ালে ব্যবহৃত ইটগুলোর মাপ ছিল জাতীয় ৭.৫ × ১৫ × ৩০ ঘন সেন্টিমিটার। দরজা জানালায় ব্যবহৃত হতো কাঠ বা শন জাতীয় উপকরণ দ্বারা তৈরিকৃত মাদুর। শক্ত মাটির ভিতের উপরে ঘন কাদার আস্তরণ দিয়ে মেঝে তৈরি করা হতো। হরপ্পার ধ্বাংসাবশেষে কোনো বাড়ির ছাদ পাওয়া যায় নাই। তাই ধারণা করা হয়, বাড়ির ছাদ নির্মাণ করা হতো কাদা ও নলখাগড়ার মিশ্রণে পুরু করে আস্তরণ তৈরি করা হতো এবং এই আস্তরণের ভার রক্ষা করতো বড় বড় কাঠের আড়া।

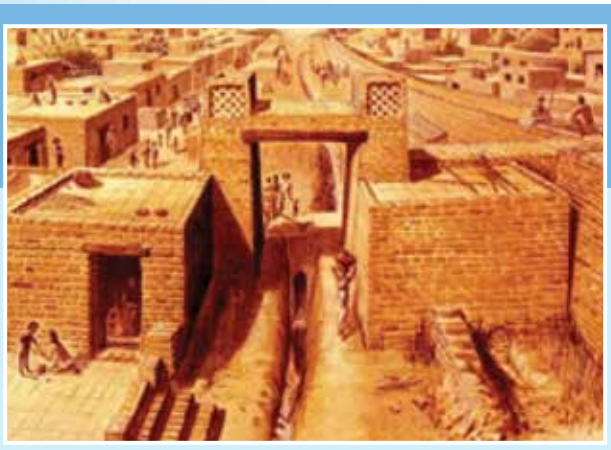

হরপ্পা; Source: themzsteriousindia.net

বসতিগুলি সামগ্রিক পরিকল্পনায় প্রায় ক্ষেত্রে আয়তাকার ও দু'টি বা ততোধিক সংখ্যক দরজাসহ ভারী সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। বসতির মধ্যে রাস্তা ও গলিগুলি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারটি প্রধান দিক বরাবর বিন্যস্ত হয়ে নগরকে তুলনামূলক সমান আকারের অট্টালিকা শ্রেণী বা সন্নিহিত অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। মহেঞ্জোদারো শহরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি নগর দুর্গের ঠিক মাথায় অবস্থিত 'মহাস্নানাগার'। নগর দুর্গের ঠিক মাথায় এটি অবস্থিত ছিল। এটি সংযুক্ত ছিলো একটি কুয়োর সঙ্গে এবং ব্যবহৃত পানি ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিলো। স্নানাগারের দেয়াল ছিলো ইটের তৈরি এবং দেয়ালের গায়ে সুরকি ও বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে পানি নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। স্নানাগারের চারপাশে ছিলো বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে তিন দিকে ছিলো কক্ষ ও গ্যালারী। ধারণা করা হয়, বর্তমানেও টিকে থাকা পাঁচ হাজার বছরেরও আগে নির্মিত এই স্নানাগারটি দ্বিতল ছিলো এবং সেখানে অনেকগুলো কক্ষ ছিলো। প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার মনে করেন স্নানাগারটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। পূজারীরা স্নান সেরে ছোট ছোট কক্ষে পোশাক বদল করত। রোমানরা সর্বপ্রথম এইচভিএসি সিস্টেম তৈরি করেছিল রোমানরা। গোসলের জন্য 'হাইপোকাস্ট' নামে অনেক বড় হাম্মামখানা পাওয়া যেত সে সময়। মেঝেতে সব সময় জ্বলন্ত আগুন একই সঙ্গে ঘর এবং হাম্মামখানাকে গরম রাখত।

প্রাচীনে গ্রিকরা ছিল পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রথম উদ্ভাবক। প্রাচীন ক্রেটান– মিনোয়ান্সরা প্রথম কাদাকে পাইপ বানিয়ে মাটির নীচে বসিয়ে দেয়। তাদের রাজধানী কোনোসোসে পরিষ্কার পানি নিয়ে আসা আর ময়লা পানি বের করে দেবার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। তারা বড় আকারে ঘরবাড়ি গরম রাখার ব্যবস্থা তৈরি করেছিল এবং টয়লেটে ফ্লাশিং ব্যবস্থা করেছিল। কার্বন পরীক্ষা দেখা গেছে, এই প্রযুক্তি চালু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব আঠারোশো শতকে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীদের জন্য পানি সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা ছিলো। কালিবঙ্গানে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে একটি করে কুয়ো ছিল। পথের ধারে অনেক কুয়ো খনন করা হতো। অনেক বাড়ির উঠোনেও কুয়ো ছিলো। বেশির ভাগ কুয়ো পাওয়া যায় গলিপথের ধারে। মহেঞ্জোদারোর চেয়ে হরপ্পাতেই বেশি কুয়ো খননের নিদর্শন রয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার বেশির ভাগ শহরের পয়ঃপ্রণালী ছিল উন্নতমানের। নগরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি বারান্দা, একটি বসার ঘর, গোসলখানা এবং নোংরা পানি বের হওয়ার জন্য স্তার নিচে ভূ-গর্ভস্থ ড্রেনের ব্যবস্থা ছিলো। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচে ড্রেন বানানো হতো। স্নানাগার ও এই ড্রেনগুলো প্রধান ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিলো। ড্রেনগুলো মাটির উপরে বা নিচে তৈরি হতো। ড্রেন তৈরিতে ব্যবহার করা হতো পোড়ানো ইট। ড্রেনের মুখ সংযুক্ত ছিলো নদীর সাথে। রাস্তার ভূ-গর্ভস্থ ড্রেনে ছিলো আধুনিককালের মতো ম্যানহোল। নগরায়নের এমন আধুনিক ধারণা অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। রোমান সভ্যতার পূর্বে অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতার এতো পরিণত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা ছিলো না। প্যারিসে প্রথম পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৫০ সালে। লন্ডনে চালু হয় ১৮৬৬ সালে। কিন্তু ব্যাবিলনে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৪০০০ বছর আগে। প্রাচীন ব্যাবিলনেই প্রথম কাদা মথিত করে পাইপের আকার দেয়া হয়, যার মাধ্যমে বাসাবাড়ি থেকে

পয়ঃবর্জ্য বের করে দেয়া হতো। বেল এট নিপ্পুর এ হাজার হাজার বছর আগের এরকম পাইপ এবং টি-জয়েন্টের নমুনা পাওয়া গেছে ।

গ্রিকরা কিছু স্থাপত্য বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে তৈরি করলেও, সেগুলোকে পরবর্তী সময়ে জ্ঞান আর টেকনোলজি দিয়ে উন্নত করায় মনোনিবেশ করে রোমানরা। ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো রহস্য হয়ে ছিল দীর্ঘস্থায়ী রোমান কংক্রিটের ফর্মুলা। দীর্ঘসময় টিকে থাকার জন্য রোমানরা খুব ভালো মানের কংক্রিট বানাতে পারত। বর্তমানে ব্যবহৃত কংক্রিটগুলো পঞ্চাশ বা এর কাছাকাছি সময়ে গেলেই দুর্বল হয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু রোমানদের তৈরি করা কংক্রিটগুলোর স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। 'আমেরিকান সিরামিক সোসাইটি অ্যান্ড আমেরিকান মিনারেলজিস্ট' সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধে গবেষকেরা জানান, কংক্রিট তৈরিতে চুনাপাথর ও আগ্নেয় শিলা ব্যবহার করত রোমানরা। তাদের কংক্রিটের সঙ্গে মেশানো চুনাপাথর ও আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ছাইয়ের মিশ্রণে সমুদ্রের লোনা পানি ব্যবহৃত হতো, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্ত কাঠের মতো দীর্ঘস্থায়ী কাঠামো তৈরি করত। দশ বছর পর, এই কংক্রিট থেকে অ্যালুমিনিয়াম টারবোমোরাইট নামে একটি দুর্লভ খনিজ তৈরি হয়, যা এই কংক্রিটের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গবেষকেরা জানান, কংক্রিট তৈরির বা কংক্রিটের উপাদান তৈরির সময় বাতাসে যাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি ছড়াতে না পারে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখত রোমানরা।

কলোসিয়ামকে বলা হতো ফ্লাভিয়ান অ্যাম্পিথিয়েটার। ৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এই রোমান কলোসিয়াম ছিল রোমানদের জন্য অনেক বড় উপহার। ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থে ১০০ দিনব্যাপী খেলার আয়োজনের জন্য খোলা হতো এটি। রোমানদের স্থাপত্যের নজির আর বিনোদনের অন্যতম প্রতীক ছিল এই কলোসিয়াম। তাদের প্রবেশদ্বার তৈরির উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে, পরে সহজে ভাঙবে না এমনভাবে তৈরি করা হয় বিভিন্ন নালা, রাজপ্রাসাদ ও গ্যালারি। প্রাচীন রোম নানা তোরণের ঘুরপ্যাঁচ, কলাম এবং গম্বুজগুলো যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে। যখন উনিশ শতকে নেপোলিয়ন তার নিজস্ব সাম্রাজ্য তৈরি করছিলেন, তিনি বেশ কয়েকটি পার্সিয়ান অবকাঠামো নির্মাণের আদেশ দেন, যা আসলে রোমানদের কাছ থেকেই ধার করা। উদাহরণ হিসাবে আর্ক ডে ট্রায়োম্ফ এবং প্যালেস ভেনডোমের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির এই বাসভবন ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজের কলাম এবং তোরণ পরিষ্কারভাবে প্রাচীন রোমেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিদেশি শত্রু থেকে মুক্ত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠা একমাত্র সভ্যতা প্রাচীন চীনারা। হিমালয় পর্বতমালা, প্রশান্ত মহাসাগর এবং গোবি মরুভূমি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাচীন চীনা সভ্যতা গড়ে উঠে ইয়াংজি নদীর অববাহিকায়। উত্তরের মঙ্গোলদের থামানোর জন্য প্রাকৃতিক এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাই চীনা সভ্যতাকে হাজার বছর যাবত সফলতার সাথে টিকিয়ে রেখেছিল। চীনা সভ্যতার সফলতার উদাহরণ সেখানকার মহাপ্রাচীর। চীনাদের দ্বারা আবিষ্কৃত সেতুগুলো ইতিহাসের গতিপথ একেবারেই পাল্টে দিয়েছে। হাজার মিটার উপরে, পাহাড় পর্বতে কিংবা দুর্গম অঞ্চলে সেতু তৈরি করে নিজেদের কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন চীনারা। ইয়াংজি নদীর সঙ্গে অন্য নদীগুলোকে যুক্ত করে পণ্য পরিবহনের যে পথ সেকালে তারা তৈরি করেছিলেন তা আজকের দিনের আধুনিক নৌ-বাণিজ্যের উদাহরণ।

অতিমারি-পরবর্তী বিশ্বের অবস্থা এর আগের থেকে অনেকখানিই ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন প্রাচীনকাল থেকেই একটি আদর্শ। প্রযুক্তি হলো রূপান্তরকারী কিন্তু এটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলকও করতে হবে। অতীতে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল সমাজের সকল অংশকে সমানভাবে উপকৃত করেনি। প্লাস ওয়ান এবং সায়েন্স অ্যাডভানসেস সাময়িকীতে প্রকাশিত পৃথক প্রতিবেদনে বলা হয়, তুলনামূলক বড় প্রাচীন শহরগুলোতে মানুষের তুলনায় কখনো কখনো সৌধের সংখ্যা বেশি ছিল। আর বাড়িঘর ও সৌধগুলো আকারেও ছিল তুলনামূলক বেশি বড়। এ থেকে বোঝা যায়, শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির বাইরেও শহরগুলো সম্প্রসারিত হয়েছিল। তবে শহর যত বড় ছিল, তার সম্প্রসারণও তত বেশি হতো। প্রাচীন শহরগুলোর সঙ্গে এ যুগের প্রযুক্তি-নিয়ন্ত্রিত মহানগরগুলোর খুব সামান্যই মিল ছিল। আধুনিক কোনো প্রযুক্তি সেখানে ছিল না। ছিল না গণপরিবহনের মতো কোনো অপরিহার্য ব্যবস্থা। অর্থনীতি তখন মূলত কৃষিনির্ভর ছিল। তবু মানুষের সামাজিক জীবনের কিছু দিক– যেভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং নির্ভরশীলতা তৈরি হয়– সেই যুগেও একই রকমের ছিল। সময়ের ব্যবধান অনেক হওয়া সত্ত্বেও গবেষকেরা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শহরগুলোর বিকাশের ধরনের ওপর নির্ভর করে একটি অভিন্ন গাণিতিক সূত্র বা সমীকরণ তৈরি করতে পেরেছেন। নতুন নতুন নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করতে গিয়ে স্থপতিরা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের উপযোগী করে পর্যাপ্ত স্থান বরাদ্দ রাখবেন। বিষয়টি থেকে সমকালীন নগর পরিকল্পনাবিদেরা নতুন বার্তা পাবেন।

ফটোগ্যালারি
১

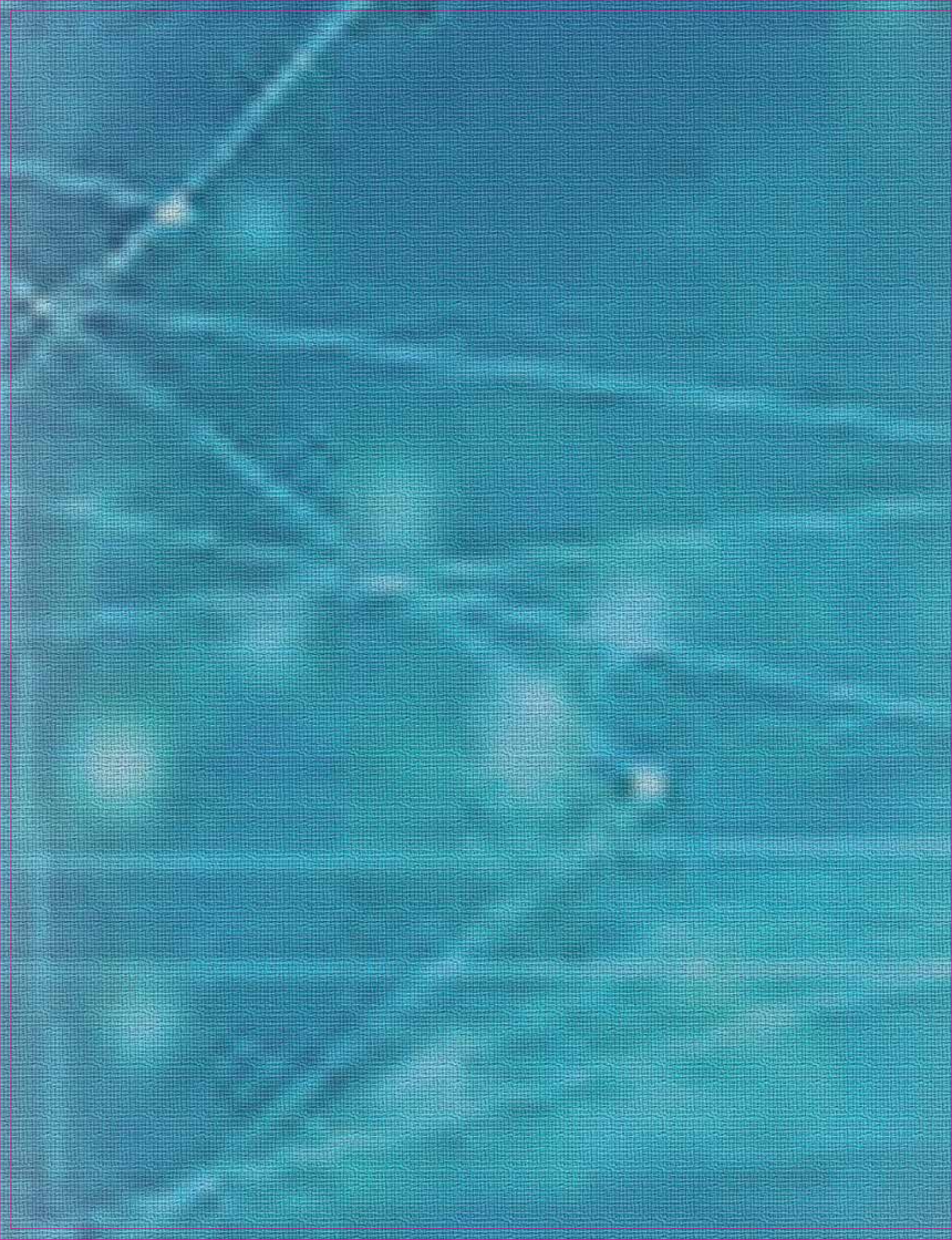

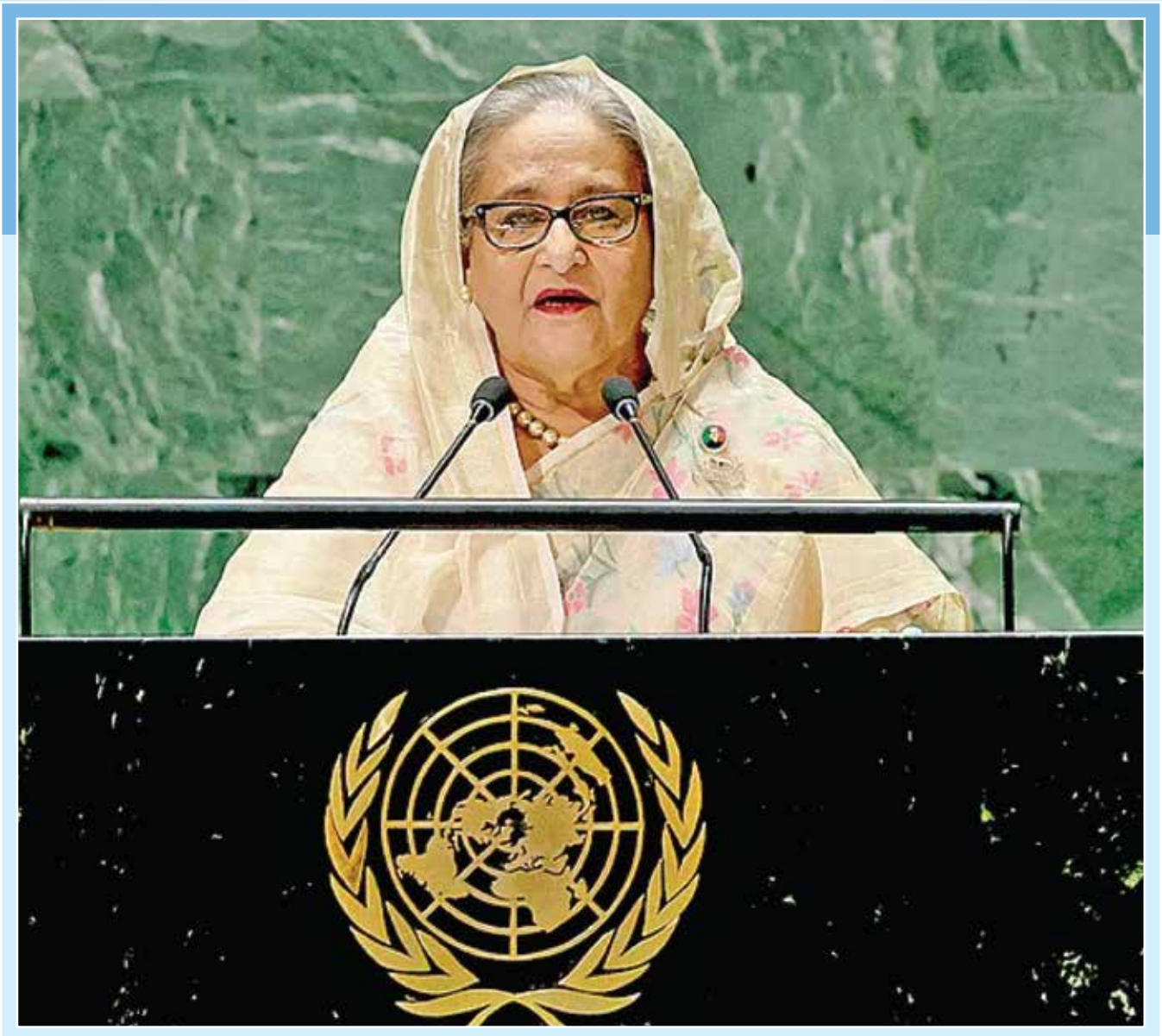

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১১টি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ময়মসিংহ সার্কিট হাউজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

জাতীয় সংসদ ভবনের সদস্য হোস্টেলের এল ডি হল-০৩ (মেম্বারস ক্লাব) এর শুভ উদ্বোধন করছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার মহোদয়

গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটির বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন

ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস সংলগ্ন মাঠে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সমাপ্তকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে দোয়া ও মুনাজাত

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১১টি প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয়

Significance of Electromechanical Works In Promoting Sustainable Cities

Shekhar Chandra Biswas

The necessity for sustainable development is becoming more and more important as cities around the world struggle with the serious issues of growing urbanization and environmental degradation. The idea of sustainability involves a wide range of elements, such as electricity distribution, transportation infrastructure, and energy efficiency.

Three crucial areas are going to be explored here: energy-efficient electrical infrastructure, cutting-edge transportation technologies for urban mobility, and smart grid technology for sustainable power distribution.

The significance of energy-efficient electrical infrastructure in accomplishing sustainability goals is covered in depth in the first proposition. Due to urban areas' growing need for electricity, it is pivotal to create systems that reduce energy use and maximize the use of resources. This section will look at many tactics, including utilizing smart meters, renewable energy integration, and energy-efficient building design, to reduce total electricity use and encourage an eco-friendly future.

The second subject matter will scrutinize cutting-edge transportation methods specifically created to meet the issues that contemporary cities face. In a city, traditional forms of transportation are becoming increasingly insufficient as populations continue to increase exponentially. In this area, we'll talk about new technologies, such as shared mobility services, electric vehicles (EVs), and sophisticated traffic management technology, that can cut carbon emissions while revolutionizing urban mobility.

Finally, we will dig into the role that smart grid technology plays in guaranteeing sustainable urban power distribution. The traditional electrical grid faces significant inefficiencies, including transmission losses and a lack of adaptability when integrating renewable energy sources. By using cutting-edge monitoring methods, this section will outline the benefits of smart grids for both analog and digital communication networks that increase dependability while maximizing the use of renewable energy.

We can learn more about these three significant areas by looking at energy-efficient electrical infrastructure, smart grid technology, and creative transportation systems for urban mobility. To promote sustainable electricity distribution, this essay will highlight the key to the construction of really sustainable, environmentally friendly towns that can meet their needs without sacrificing the welfare of future generations.

Energy-efficient Electrical infrastructure:

Energy-efficient electrical systems are a crucial component of the electromechanical operations necessary for the construction of sustainable cities. It is impossible to emphasize the importance of this topic because it holds the secret to making cities grow in harmony with their surroundings. We can use cutting-edge methods and

Superintending Engineer, PWD E/M Design Circle, Dhaka

technologies to transform our current electrical system and open the door to a greener and more ecologically sound urban environment. Enhancing the energy efficiency of electrical infrastructure is one strategy through the use of smart grids. These sophisticated systems make use of sensors and communication technology to monitor and regulate the flow of power in real time. Depending on demand patterns, power distribution can be changed dynamically.

Intelligent grids can optimize energy use, cut down on waste, and ultimately minimize carbon emissions. Additionally, these grids can self-heal, allowing them to quickly identify problems or malfunctions and reroute electricity as necessary, maintaining a constant power supply while reducing downtime.

The incorporation of renewable energy sources is another direction that should be investigated in the underlying electrical systems. Sustainable towns can use solar or wind power turbines to produce local, clean electricity. This dispersed strategy not only decreases dependency on fossil fuels while also reducing transmission losses across vast distances for moving electricity. Additionally, integrating renewable energy with battery storage systems and energy sources provides effective energy management by keeping extra energy during times of low demand and releasing it when it is most needed. Additionally, a decisive component of electrical infrastructure that is energy-efficient is encouraging people to conserve energy. Smart meters installed at residential or business premises allow people to track their energy usage in real time to ensure correct consumption. With this knowledge, they may make wise decisions about their consumption habits and pinpoint opportunities for development to reduce waste. Incentives like time-of-use pricing are also available and might persuade users to change their high-energy consumption behaviors at times of day when demand is lower, off-peak.

Because of its potential to alter contemporary urban environments, the subtopic of energy-efficient electrical infrastructure within electromechanical works for urban sustainability deserves immediate attention. We may establish a future where cities develop in accordance with their natural setting through the use of smart grids, embracing renewable energy sources, and promoting energy conservation among inhabitants. By utilizing these cutting-edge strategies and instruments, metropolitan areas will become more resilient, self-sufficient, and far more prepared to face the hardships of a rapidly changing world.

Innovative Transportation Technologies for Urban Mobility:

Innovative transportation solutions for urban mobility must be developed in the field of electrical and mechanical engineering to promote sustainable urbanization. With these cutting-edge modes of transportation, communities are propelled into a future where mobility is effective, environmentally friendly, and integrated seamlessly.

The concept of automated flying cars, which have the potential to transform urban transportation, is one such ground-breaking system. Imagine a busy metropolis with sleek electric air taxis gliding overhead, negotiating congested streets and avoiding gridlocked traffic with ease. Although it may appear like something out of an actual science fiction film, this futuristic vision is quickly turning into a reality. These self-driving aircraft are thrilling, but they also have a lot of promise to revolutionize urban transportation. By flying, they relieve traffic on the ground and significantly cut commuter travel times. Additionally, these aircraft may run on electricity rather than fossil fuels, which makes them environmentally beneficial and helps places with bad air quality. Morevere, they can operate from small helipads or even rooftops in highly populated regions thanks to their vertical takeoff and landing capabilities, which negate the need for major infrastructure upgrades. but it's rapidly becoming fact, like something out of a science fiction film. The creation of hyper loop systems is another unprecedented achievement in urban transportation. With the aid of electromagnetic levitation, these

future pod-like vehicles will zoom through vacuum-sealed tubes at speeds of more than 600 mph (965 kph). With their unparalleled speed and efficiency, commuters may cover huge distances in a matter of minutes rather than hours while consuming very little energy.

Additiona in a hyper loops have the ability to connect far away cities with ease, essentially eliminating physical obstacles while encouraging regional economic growth. Hyper loops may further decrease their carbon footprint by utilizing renewable energy sources like solar power or regenerative braking devices that transform kinetic energy into electricity during deceleration periods

Urban mobility as we currently understand it is being redefined by several cutting-edge transportation technologies that are part of the electrifying mechanical works necessary for sustainable cities. Autonomous flying cars that glide above urban landscapes offer quick commutes, less traffic, and cleaner air. Similar to this, hyper loop systems have the potential to transform long-distance travel while limiting environmental effect thanks to their remarkable speed and energy efficiency. Embracing these cutting-edge transportation solutions is crucial for a greener and more efficient future as communities work to establish sustainable urban landscapes.

Smart Grid Technology for Sustainable Power Distribution:

Smart grid technologies greatly aid sustainable development in urban power distribution. This sophisticated infrastructure improves upon existing power grids by incorporating cutting-edge communication, control, and monitoring technologies. The smart grid improves electricity production, transmission, and use through the use of real-time data analysis and machine-learning techniques. Having such modern technology in place allows for better control over energy usage, less waste, and more sustainability for the environment.

The ability of smart grid technology to increase overall system reliability is one of its main benefits. Due to declining infrastructure or unanticipated events, traditional power systems frequently experience regular outages and blackouts. However, smart grid technology makes real-time monitoring possible and enables quick isolation of broken parts or high-demand areas. System operators will receive quick notifications when maintenance or repairs are required, enabling to carry them out without substantially interrupting the power supply.

A further important aspect proven achievable by smart electricity networks is the use of sources of clean energy. Depending on the weather, solar panels and wind turbines produce electricity intermittently. A smart grid, however, may successfully control these oscillations by allocating excess energy produced during peak periods for later usage during low-demand hours. This not only guarantees a steady supply of electricity but also maximizes the use of renewable resources while reducing dependency on fossil fuels.

Furthermore, by utilizing advanced grid technologies, consumers actively contribute to the distribution of sustainable power. Consumers become more aware of their electricity consumption habits when they have access to real-time information about their energy usage patterns and expenses through user-friendly interfaces offered by smart meters or mobile applications. Armed with this information, they may make wise choices about their energy usage by taking actions like scheduling high-energy activities for off-peak times or buying more energy-efficient products, which will ultimately reduce their carbon footprints.

For modern cities to achieve sustainable electricity distribution, innovations in smart grids must be integrated into urban environments. Through real-time monitoring and quick response mechanisms, it can increase system reliability and guarantee a constant supply of electricity. The use of renewable energy sources and active customer participation in energy management also contribute to environmental sustainability. Smart grid technology is a workable option for maximizing energy output, transmission, and consumption while reducing environmental effects as cities continue to expand and demand for electricity rises.

A comprehensive strategy that incorporates energy-efficient electrical infrastructure, cutting-edge transportation systems for urban mobility, and smart grid technologies for sustainable power distribution is required for the development of sustainable cities. A greener and more efficient urban environment depends on these three interconnected factors.

Energy-efficient electrical infrastructure is essential to reducing greenhouse gas emissions and conserving resources. By implementing advanced technologies such as LED lighting, smart meters, and efficient building designs, cities can significantly reduce their energy consumption. This not only benefits the environment but also lowers electricity costs for residents and businesses.

Advanced transportation systems play a vital role in promoting sustainable mobility within cities. The integration of electric vehicles, bike-sharing programs, and efficient public transportation networks can help reduce traffic congestion and air pollution. Moreover, incorporating renewable energy sources into transportation systems further will aid in sustainability goals.

Utilizing smart grid technology, which optimizes energy use and incorporates renewable energy sources into the grid, makes it possible to control power distribution effectively. With the help of this clever system, electricity flow can be monitored and managed in real-time in order to effectively balance supply and demand. Cities can reduce their dependency on fossil fuels while assuring a consistent power supply by employing clean energy sources like solar or wind power.

In establishing sustainable cities that prioritize environmental preservation without compromising quality of life, electromechanical works are fundamental. Achieving long-term sustainability goals requires the adoption of energy-efficient electrical infrastructure, cutting-edge transit systems for urban mobility, and smart grid technology. To guarantee a more environmentally friendly future for subsequent generations, governments, urban planners, engineers, and individuals must collaborate to adopt these solutions.

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও স্থিতিশীল নগর অর্থনীতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান এবং স্বনির্ভর নির্মাণ উপকরণ শিল্পের ভূমিকা

মো. নাফিজুর রহমান[১]
মনজুর পারভেজ[২]

একটি দেশের টেকসই উন্নয়নে স্বনির্ভর নির্মাণ উপকরণ শিল্পের ভূমিকা অবকাঠামো নির্মাণের প্রগতি অথবা নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্র ছাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি অবিস্মরণীয় নগরকেন্দ্রিক অবকাঠামোগত রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে যার স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিতে স্বনির্ভর নির্মাণ উপকরণ শিল্পের ভূমিকা অসামান্য। ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আম্কটাডের সর্বশেষ বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০২৩ অনুসারে, সামগ্রিকভাবে স্বল্প উন্নত (এলডিসি) ভুক্ত দেশসমূহতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ ১৬ শতাংশ কমলেও বাংলাদেশে তা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সহযোগী হিসাবে কাজ করে চলেছে দেশের নির্মাণশিল্প, যা বর্তমানে ৩০.৩৮ বিলিয়ন ডলারের একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর এবং ২০২৮ সালে ৬.৪২% প্রবৃদ্ধিতে ৪১.৪৭ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হবে বলে অর্থনীতিবিদগণ ধারণা করেন। নির্মাণশিল্পের মূল উপকরণসমূহের যোগান দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশের নির্মাণ উপকরণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন– সিরামিক, সিমেন্ট, স্টিল, ব্রিকস ও ব্লক ইন্ডাস্ট্রি। এই নির্মাণ উপকরণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে নয় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নেও বিপুল পরিমাণ অবদান রেখে যাচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের মত ঘন জনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল একটি দেশে নির্মাণ সামগ্রী শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও কর্মসংস্থান তৈরি, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন বৃদ্ধিকরণ, নগরের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন, রপ্তানিখাতে প্রবৃদ্ধিসহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও দুর্যোগ প্রতিরোধে নির্মাণ উপকরণ শিল্পের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বাংলাদেশ বর্তমানে স্মরণকালের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ মেগাপ্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো সেক্টরের অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে। যেখানে পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্নফুলি রিভারটানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো আরও অসংখ্য প্রকল্পের মূল নির্মাণ উপকরণ দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হয়েছে। পদ্মাসেতু প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্টিল ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন হলেও রড, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক কেবল, পাইপ, বিটুমিনসহ প্রায় ৩০ ধরনের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রায় সবটাই দেশীয়। সেতুবিভাগের তথ্য অনুসারে পদ্মাসেতুতে ব্যবহৃত ২.৫ লাখ টন সিমেন্ট, ৯২ হাজার টন রড, ২ হাজার টন বিটুমিন, ২৪ লক্ষ জিও ব্যাগ ও ২.৭৫ লাখ মিটার বৈদ্যুতিক কেবল সম্পূর্ণভাবে দেশে উৎপাদিত। এই বিপুল পরিমাণ নির্মাণ উপকরণের চাহিদা যোগান দিয়ে আমাদের দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বিশেষ কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই সকল নির্মাণ উপকরণের বৈদেশিক রপ্তানি ও বৈদেশিক বিনিয়োগের আস্থা তৈরি হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নির্মাণ উপকরণ শিল্প একটি শ্রমনিবিড় শিল্প। এই শিল্পের উন্নয়ন সরাসরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা বেকারত্ব নিরসন ও সামাজিক মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পরিসংখ্যানে এসেছে যে বর্তমানে দেশে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ উপকরণ শিল্পে ২০টির অধিক দেশের বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীগণ কাজ করে চলেছে। যার মাধ্যমে দেশে সরাসরি মেধার উন্নয়ন, সমন্বয় ও বহুজাতিক উন্নয়ন

[১]প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট
[২]মনজুর পারভেজ, সিনিয়র রিসার্চ আর্কিটেক্ট (অ:দা:), হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট

কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও নির্মাণ উপকরণ উৎপাদন শিল্প দেশে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে, যা ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব তৈরি করে চলেছে।

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

নির্মাণ উপকরণ প্রস্তুতকরণ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। করোনা মহামারী পরবর্তী অর্থনীতি, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত জ্বালানি সংকটের পরও ২০২২-২৩ অর্থবছরে টাইলস ও সিরামিক পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৪৩.৩৯ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪.৯১ শতাংশ বেশি (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)। রপ্তানির ক্ষেত্রে সিমেন্ট শিল্পও একটি অমিত সম্ভাবনাময় একটি সেক্টর। বর্তমানে দেশে ৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন সিমেন্ট এর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৫৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে। কাঁচামালের উপর শুল্ক ও সরকারি নীতিমালা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হলে এই শিল্প রপ্তানি খাতে বিপুল পরিমাণ অবদান রাখতে পারবে বলে আশাবাদী বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমানে দেশে সিমেন্ট শিল্পের ৮৫ শতাংশ দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং বাকি ১৫ শতাংশ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে ৪২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এবং বছরে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি শুল্ক সরকারি কোষাগারে এই খাত থেকে জমা হয়। (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন রিপোর্ট: ২০২২)। এভাবেই বাংলাদেশের নির্মাণ উপকরণ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশে নির্মাণ উপকরণ শিল্পের মানন্নোয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীগণের প্রশিক্ষণসহ 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)' এর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ উপকরণ শিল্পের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রেগুলো নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন ও স্থিতিশীল নগর অর্থনীতিতে এই শিল্পের ভূমিকা তুলে ধরা হলো।

টাইলস ও সিরামিক শিল্প

নির্মাণ উপকরণের মাঝে টাইলস ও সিরামিক ওয়্যার যেমন বেসিন, সিংক, কমোড একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর, যেখানে বাংলাদেশ ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে আরএকে, ডিবিএল, আকিজ, মীর, গ্রেটওয়াল, এক্সসিরামিক, চায়না বাংলা, স্টার সিরামিকসহ আরও অসংখ্য কোম্পানি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিরামিক পণ্য রপ্তানি করে দেশের ৪৩.৩৯ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪.৯১ শতাংশ বেশি। এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানিতে অন্যান্য সিরামিক পণ্যের সাথে একটি বড় অংশ দখল করে আছে নির্মাণসংক্রান্ত উপকরণ যেমন– টাইলস, বেসিন ইত্যাদি। করোনা মহামারী ও তার পরবর্তী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত না হলে এইখাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আরও বাড়ত বলে মত প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফেকচারারস এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। নির্মাণ উপকরণ হিসাবে এই টাইলস ও সিরামিক শিল্পের উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরিতে কাজ করছে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এইচবিআরআই)। দেশে প্রস্তুতকৃত টাইলস এর মানন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টেস্টিং ও রিসার্চের পাশাপাশি দেশে দক্ষ টাইলস ফিটার এর প্রয়োজনীয় তাকে মাথায় রেখে আরএকে সিরামিক্স এর সাথে যৌথভাবে সারাদেশে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫০০ এর অধিক নিবন্ধিত দক্ষ টাইলস ফিটারের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বাতায়নে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

রড ও স্টীল শিল্প : যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের জন্য তৎকালীন সময়ে রড আমদানি করতে হয়েছিল বেলজিয়াম থেকে। সেই সময়ে দেশীয় কোম্পানিগুলো উপযুক্ত মানের রড সরবরাহ করতে পারেনি। আজ সারাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি হয়েছে দেশে উৎপাদিত রড দিয়ে। দেশে বিশ্বমানের যেসব স্থাপনা, সুউচ্চ ভবন, সড়ক অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে তার জন্য নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম এই রড এখন আর আমদানি করার প্রয়োজন হচ্ছে না। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, মেট্রোরেল, ঢাকা-চট্টগ্রামের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরসহ চলমান মেগা প্রকল্প নির্মাণের যাবতীয় রডের সরবরাহ নিষ্ঠার সাথে মান সম্মতভাবে করে চলেছে আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। দেশের আবাসন খাত ও সরকারের অবকাঠামো নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে রড, সিমেন্ট, সিরামিক, রং, ইট, বালুসহ ২৬৯টি উপখাত ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। যার মধ্যে রড, সিমেন্ট, সিরামিক খাতে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শিল্প। দেশেই তৈরি হচ্ছে বিশ্বমানের রড-বিলেটসহ ইস্পাত সামগ্রী। ইস্পাত শিল্পে এমন যুগান্তকারী পরিবর্তনে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইস্পাতের পাশাপাশি সিমেন্টসহ নির্মাণ সামগ্রীতে বাংলাদেশ এখন শুধুমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় বরং এসব সামগ্রী রফতানিও হচ্ছে দেশের বাইরে। প্রথাগত ইস্পাতের উৎপাদন পেরিয়ে ইতোমধ্যে দেশে High Strength Steel-এর উৎপাদন চালু হয়েছে, যা নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করেছে। দেশে লক্ষ কোটি টাকার অসংখ্য মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে দেশি-বিদেশি বিশাল অঙ্কে গড়ে উঠছে ভারী শিল্প কারখানা। এতে কর্মসংস্থান বাড়ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতি।

সিমেন্ট শিল্প : দেশে ক্রমবর্ধমান নির্মাণ কর্মতৎপরতার সাথে সিমেন্ট শিল্পও অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দীর্ঘকাল ধরেই নির্মাণ কাজে ইটপাথর বা অন্যান্য বস্তু দিয়ে গাঁথার কাজে সিমেন্ট সংযোজক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রচলিত সিমেন্টের মধ্যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বহুল ব্যবহৃত, যা চুন ও কাদার মিশ্রণ পুড়িয়ে পাউডারের মতো চূর্ণ করে তৈরি করা হয়। বালি ও পানির সাথে সিমেন্ট মিশিয়ে 'মর্টার' এবং ইট বা পাথরের টুকরা, সিমেন্ট, বালি ও পানি মিশিয়ে কংক্রিট তৈরি করা হয়। বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ২৫ মিলিয়ন টন সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়, যা দেশেই উৎপাদিত হয়। সিমেন্ট উৎপাদনে দেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও (ভারত, মিয়ানমার) এখন সিমেন্ট রপ্তানি হচ্ছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশে জনপ্রতি সিমেন্ট ব্যবহার ছিল মাত্র ৬৫ কিলোগ্রাম। বিশেষত পার্শ্ববর্তী ভারত (১৫০ কিলোগ্রাম), ইন্দোনেশিয়া (১২৭ কিলোগ্রাম), মালয়েশিয়া (৫২৯ কিলোগ্রাম) এবং থাইল্যান্ডের (৪২৫ কিলোগ্রাম) তুলনায় এ পরিমাণ খুবই কম। এক সময়ে দেশের বাজারে বিদেশি সিমেন্টের রাজত্ব থাকলেও সেটি এখন পুরোপুরিই দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে। ক্রমেই তার পরিসর বাড়ছে। বলা চলে, সিমেন্টের বাজার এখন প্রায় পুরোপুরিই দখলে রেখেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। শুধু তাই নয়, দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশী সিমেন্ট অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। গুণগত মানসম্পন্ন বাংলাদেশী সিমেন্টের কদর বিদেশের বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্ভাবনাময় সিমেন্ট শিল্পের এ উত্থানের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে বলে মত সংশ্লিষ্টদের। সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের তথ্যসূত্র মতে, গত দুই দশক ধরে দেশের সিমেন্ট শিল্প অনেক এগিয়েছে। বাংলাদেশের সিমেন্টের মানও অনেক উন্নত। একই সঙ্গে দেশের সিমেন্ট উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। দেশে এখন সিমেন্টের চাহিদার পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, সেখানে বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে ৫৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ফলে এখন দেশের চাহিদা পূরণ করে সিমেন্ট রপ্তানি করাও সম্ভব।

স্যানড সিমেন্ট ব্লক প্রস্তুতকারক শিল্প : নির্মাণ উপকরণ হিসাবে মাটি পোড়ানো ইট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। পরিবেশ দূষণকারী পোড়া মাটির উৎপাদনের জন্য দেশে ৮ হাজারের বেশি ইটভাটা রয়েছে। বছরে দেশে প্রায় ২৩ বিলিয়নের বেশি ইট উৎপাদন হচ্ছে। ইট তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় মাটি। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বছরে প্রায় ৩৩ হাজার ৫০ মিলিয়ন কিউবিক ফুট মাটি ইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ইটখোলাগুলো থেকে নির্গত দূষিত উপাদানের প্রাদুর্ভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, বছরে প্রায় ১৫ দশমিক ৬৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড ইটখোলা থেকে বায়ুমণ্ডলে যোগ হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলছে। পরিবেশ দূষণ, উর্বর কৃষিজমি হ্রাস পাওয়াসহ দেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে বাংলাদেশ সরকার পোড়া মাটির ইটের ব্যবহার ২০২৫ সালের ভিতরে পর্যায়ক্রমে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। পোড়া মাটির প্রথাগত এই ইটের পরিবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে নদীর তলদেশের ড্রেজিং বালির সাহায্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব Sand Cement Block ও Aerated Autoclaved Concrete-এর মতন বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর উদ্ভাবন, উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা নির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এই পর্যন্ত ২০টির অধিক ধরনের পরিবেশবান্ধব ব্লক ও আরও ১৭ ধরনের ওয়ালপ্যানেল, রুফ চ্যানেলসহ বিভিন্ন নির্মাণ উপকরণ উদ্ভাবন করেছে। নির্মাণ উপকরণের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার পাশাপাশি এই সেক্টরের দক্ষ জনবল তৈরির জন্য সারা দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও পরিচালনা করে আসছে এইচবিআরআই। বর্তমানে দেশে ২০০ এর অধিক পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে ১২৫টি ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাইপূর্বক হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিজিটাল ডাটাবেজ এ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে, যে ডিজিটাল ডাটাবেজ এর মাধ্যমে জনসাধারণ পরিবেশবান্ধব ব্লক ও তাদের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য ঘরে বসেই সহজে জানতে পারবে। এছাড়াও ব্লকের উদ্যোক্তা সম্প্রসারণ ও মান সম্পন্ন ব্লকের উৎপাদনের জন্য সারাদেশের ড্রেজিং বালি সংগ্রহ করে তার গুণগত মানের ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। যে তথ্যের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব এসব ব্লক উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল 'বালি'-এর প্রাপ্যতা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

নির্মাণ উপকরণ শিল্প একটি দেশের উন্নয়নের সরাসরি সহযোগী একটি সেক্টর। এই সেক্টরের উন্নয়নের সাথে দেশের স্থিতিশীল নগর উন্নয়ন সরাসরি সম্পর্কিত। বাংলাদেশের নির্মাণ উপকরণ প্রস্তুতকরণ শিল্পক্রমেই স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নির্মাণ উপকরণ শিল্পটি প্রধানত উন্নত বিশ্বের অনুকরণে প্রযুক্তি আমদানির মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে টেকসই উন্নয়নের জন্য দেশীয় কাঁচামাল ও স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী করে এই সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণার প্রয়োজন। শুধুমাত্র নির্মাণ উপকরণের গুণগত মানোন্নয়ন, স্থায়িত্ব বৃদ্ধি নয়, এই সেক্টরের উন্নয়নে যথাযথ বাজার সংক্রান্ত গবেষণা, বৈশ্বিক উষ্ণতা নিরসনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট এনালাইসিসসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এই সেক্টরকে নতুন শতাব্দীর জন্য সবুজ শিল্পে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২।

২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-Labour Statistics in Bangladesh - An empirical analysis

৩। বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন রিপোর্ট: ২০২২

৪। বাংলাদেশ বক ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন রিপোর্ট ২০২২

Structural Regularity in Building Design: Enhancing Resilience in the City for Disaster Risk Reduction

Dr. Mohammad Sharfuddin[1]
Sawgat Ahmed Shuvo[2]

Cities serve as the economic engines of the world, collectively generating more than 80% of the global Gross Domestic Product (GDP). Consequently, any economic turmoil within cities affects both urban and rural areas impacting the life of the people all across the globe. Several critical infrastructures support the city economies; such as buildings, roads, bridges, and many more.

Within this urban landscape, buildings emerge as central players, accommodating the businesses, industries, and institutions that fuel the economic activities of a city. Commercial structures serve as the backbone for offices, retail stores, and restaurants; while industrial facilities facilitate manufacturing and logistical operations. The nature and concentration of these buildings reflect the unique economic specialization of each city.Therefore, it becomes imperative to prioritize the resilience of buildings as a fundamental component of overall city resilience.

This article will demonstrate how the structural regularity in building design can impact the building resilience for Disaster Risk Reduction (DRR) through triple bottom line perspectives of environmental, economic and social. Structural regularity of building refers to some characteristics such as continuous load paths, uniform floor heights, symmetrical floor plans and equal resistance to lateral loads along both orthogonal axes. Bangladesh National Building Code 2020 illustrated several types of plan and vertical irregularities in article 2.5.5.3. Certainly, structurally irregular buildings come with a set of advantages and disadvantages. On the positive side, they offer opportunities for enhancing architectural aesthetics, customizing floor plans to specific needs, and optimizing the use of irregular sites. However, on the flip side, they present disadvantages such as reduced structural integrity, increased construction complexities, and greater vulnerability during disasters like earthquakes.

When a building is irregular in its structural design, it tends to generate greater internal forces, including axial force, shear force, and torsion. These irregularities can significantly impact the structural integrity and stability of the building. To compensate for these increased internal forces and to maintain the required level of structural strength and safety; it becomes necessary to use more concrete and reinforcement materials. Even sometimes it becomes nearly impossible to compensate those irregularities. When the quantity of construction materials used in building projects increases, it typically results in higher embodied greenhouse gas (GHG) emissions.

[1]Executive Engineer, PWD Design Division-6, Dhaka
[2]Sub-Divisional Engineer, PWD Design Division-6, Dhaka

Embodied GHG emissions refer to the total carbon footprint associated with the production, transportation, and installation of construction materials and components. A study has found that a 15-story reinforced concrete building with a moderately irregular floor plan generates approximately 1% more embodied greenhouse gas (GHG) emissions per square meter of net floor area compared to a regular floor plan building, while the similar building with a highly irregular floor plan generates over 3% more Embodied GHG Emissions (EGHGE). With the increase of the height of the building, the net area increases and the amount of EGHGE also increases. As reported in the Sixth Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), buildings accounted for approximately 21% of worldwide greenhouse gas (GHG) emissions in the year 2019. Therefore, reduction of EGHGE regarding the structural regularity can significantly reduce the overall carbon footprint and enhance building resilience from ecological perspective.

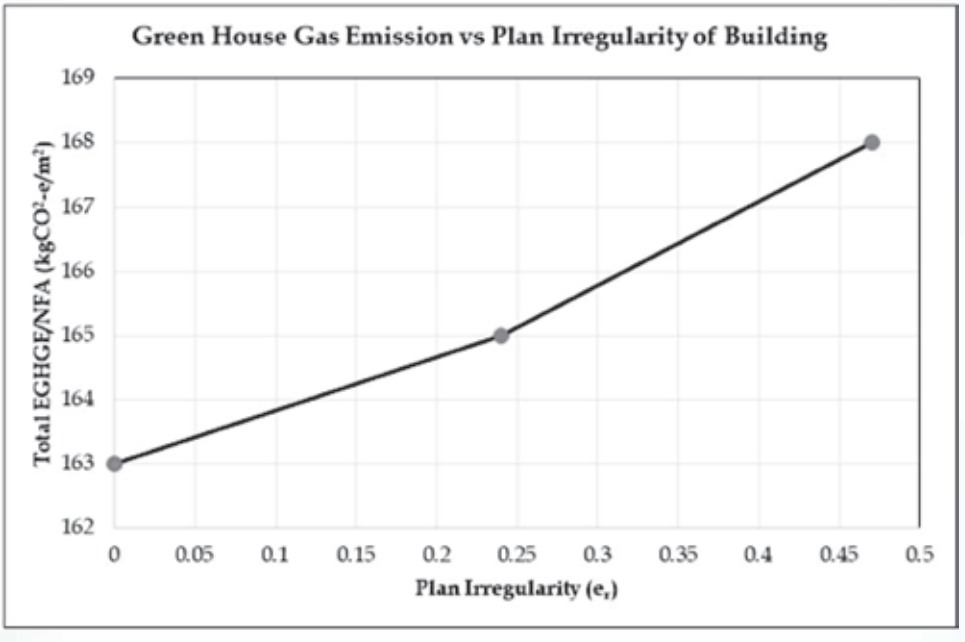

Certainly, an increase in the quantity of construction materials results in a corresponding rise in construction costs. Moreover, during disaster like earthquake; structurally irregular buildings are at a notable risk of damage. This demands a substantial investment in retrofitting and repairs in the post-disaster period which leads to an escalation in the building's overall life cycle cost. Besides, numerous studies have illustrated that earthquake-induced damage to buildings amplifies "business interruption (BI)" losses, which can substantially hamper a city's economic resilience during disaster. Moreover, earthquake causes structural damage and even collapse of the building which causes deaths and injuries. Therefore, these events cause greater loss of social wellbeing of a community. The catastrophic earthquake that struck Turkey on February 6, 2023 has led to significant loss of life, displaced millions in nearly a dozen cities, and cause economic damage to approximately 4% of the country's annual economic production. Enhancing the structural resilience of buildings can contribute to an increase in the social resilience of a city.

The preceding discussion underscores the fact that structurally regular buildings offer greater resilience in terms of ecological, economic, and societal considerations. However, this raises the question of whether we should avoid the construction of irregular buildings.BNBC 2020 provided different provisions to incorporate those irregularities. However, it is preferable to maintain the structural regularity while accommodating

thearchitectural irregularities to increase the aesthetics and floor functionality.

Structural regularity in building design is not merely a technical consideration; it is an important issue of urban resilience and sustainability. As cities continue to evolve, prioritizing regularity in building design is essential for a future where cities prosper economically while minimizing their impact on the planet.

References :

1) Taranath, B. S. (2009). Reinforced concrete design of tall buildings : CRC press.

2) Helal, J., Mehdipanah, A., Stephan, A., Lumantarna, E., & Crawford, R. H. (2022). Embodied greenhouse gas emissions of structural systems for tall buildings: is there a premium for plan irregularity?. ASA 2022, 273

3) Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., . . .Gomis, M. (2021). Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, 2.

4) Wein, A., & Rose, A. (2011). Economic resilience lessons from the ShakeOut earthquake scenario. Earthquake Spectra, 27(2), 559-573.

5) Oliva, S., &Lazzeretti, L. (2018). Measuring the economic resilience of natural disasters: An analysis of major earthquakes in Japan. City, culture and society, 15, 53-59.

6) The World Bank. (2023). Urban Development. Retrieved 14th September, 2023, from https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

Role of PWD for Ensuring Sustainable Cities and Resilient Urban Economics in Bangladesh

SK ToufiqurRahman[1], Md. Kamruzzaman[2], Md. ShafiqurRahman[3]

Resilient urban economics is an approach to economic development in urban areas that prioritizes enhancing the capacity of cities to withstand and recover from disruptions and stresses while also fostering sustainable growth. Bangladesh has experienced a dramatic transition from a predominantly agricultural to an increasingly urban society. Today, cities such as Dhaka, Chittagong, and Sylhet are hubs for industrial production, commerce, and human capital. However, the increasing concentration of resources and population in urban areas also poses an important issue: vulnerability to natural disasters like cyclones, floods, and earthquakes.

Adopting a resilient urban economic framework is crucial for promoting long-term economic stability and prosperity. In Bangladesh, the Public Works Department (PWD) emphasizes the importance of resilient urban economies, in which sustainable infrastructure is not merely an aspirational objective but an operational necessity. Improved housing and infrastructure can stimulate economic growth by creating jobs and attracting businesses. This article examines how the construction of resilient and sustainable public and industrial infrastructures could have a significant influence on Bangladesh's urban economic growth and recovery.

The construction of resilient and sustainable domestic, industrial, and infrastructure facilities can indeed have a significant influence on Bangladesh's economic growth and recovery. Resilient infrastructure ensures that businesses can continue to operate even in the face of adversity. This helps maintain economic stability by reducing disruptions to production and supply chains. A resilient infrastructure also attracts foreign investment, as investors are more likely to commit resources to areas with dependable infrastructure. The impact of natural disasters on industrial production cannot be overstated. Cyclones, floods, and earthquakes have the capacity to halt production lines, damage machinery, and disrupt labor forces for prolonged periods. This is an avoidable risk if industrial buildings are constructed to be more sustainable and less vulnerable to natural calamities.

The recent earthquakes in Turkey and Morocco have demonstrated the tragic loss of life and severe economic damage. The economic impacts are mainly due to the damage to buildings and cities, which would cost a lot of money. Damage to structures and infrastructure is the most obvious and immediate effect of earthquakes. They demolish equipment, structures, and infrastructure, and they impede production. An earthquake inflicts serious indirect effects as the economic damage spreads through trade networks and supply chains. Developing countries like Bangladesh are more likely to experience more severe negative growth effects. Evidence from past earthquakes with at least 1,000 fatalities, such as those in Chile, Colombia, Haiti, India, Indonesia, Italy, and Japan,shows that in the year after an earthquake, GDP is, on average, around one percentage lower than otherwise comparable economies(1). Most of the economic cost relates to reconstruction. According to the World Bank, the cost of direct physical damage caused by earthquakes is equivalent to 4 percent of Turkey’s

[1]Executive Engineer, PWD, [2]Sub Divisional Engineer, PWD, [3]Assistant Engineer, PWD

GDP in 2021, and for Morocco, the cost to theeconomy could be as much as 8% of GDP[2].

It is essential to implement stringent building codes for industrial buildings to ensure their safety, durability, and compliance with local regulations. Site selection and planning for industrial and infrastructure facilities that minimize environmental impacts, such as avoiding flood and earthquake-prone regions, The Public Works Department (PWD) follows the provisions of Bangladesh Building Code and standard construction practices to ensure the building's ability to withstand heavy equipment, machinery, and loads by mandating seismic-resistant designs with proper detailing.PWD started following the latest Bangladesh National Building Code (BNBC-2020) as soon as it became effective. This includes specifying appropriate building materials, ensuring proper structural design with proper analysis considering soil type, seismic zone, seismic design category, appropriate framing system, structural importance category and respective suggested load for the structure.Structures which are designed by following BNBC-2020 allows facilities to withstand extreme weather events, natural disasters, and other shocks like Earthquake.

Industrial structures play a vital role in the total GDP and economic sustainability of any country. If industrial structures are constructed to withstand the forces of nature, they can continue to function under adverse circumstances. This has a double economic benefit. First, sustained production ensures that the domestic market remains unaffected, thereby preserving economic stability. Second, many industries in Bangladesh, such as the garment industry, are primarily export-oriented. Continued production after any natural disaster ensures a steady supply of exports and, by extension, remittances. Thus national economy will not collapse drastically after disasters like earthquake or flood and economic revival will be a relatively easier task. PWD is responsible for the structural design vetting of buildings including private and industrial buildings sent by Building Construction (BC) committee to PWD. In this process PWD follow the BNBC-2020 strictly which contributes significantly to ensure urban resiliency.

Another most forward-looking approaches to resilient urban economics is the focus on green building. Green buildings are designed to reduce negative impacts on the environment and provide healthy spaces for people. The Public Works Department (PWD) has a significant impact on the development and implementation of green building practices in a region. The design of green buildings and infrastructure emphasizes energy efficiency, water conservation, and waste reduction. This includes the use of locally sourced or recyclable materials. The use of green infrastructure solutions, such as permeable pavements, green roofs, and rainwater harvesting systems, serves to effectively manage storm water and mitigate the urban heat island effect. The use of energy-efficient and renewable energy technologies, such as LED illumination and modern HVAC systems, is necessary in order to mitigate energy usage. The integration of renewable energy sources, such as solar panels, into the facility's design can effectively reduce dependence on fossil fuels and mitigate carbon emissions.

A safe, healthy, affordable and sustainable housing is a basic need of every human being and their family along with food and clothes. To become a productive and effective member of society, to ensure blossoming of children and thriving of families, a decent living place is mandatory. It is more than a basic need; without which a society cannot become civilized, flourished and progressed. PWD is working relentlessly to ensure sustainable cities by implementing sustainable housing projects. Among the implemented housing projects by PWD, "Construction of multistoried residential apartments for government employees in Azimpur, Dhaka" has created an illustration of sustainable, safe, and environment-friendly urban housing with modern facilities[3]. The project has ground coverage of only 21%; 79% of the area is open or covered with greenery. Already, more than 3000 trees of fruits and medicinal plants and a great number of flowering trees have been planted. Three big play fields, two mind-blowing water bodies, and walkways are providing the best living environment. The residential apartments are well designed to ensure cross-ventilation and natural lighting. For the prevention of

fire hazards, emergency exits and firefighting equipment are installed on every floor.

The project was planned and designed to be environmentally sound and energy efficient. To minimize electricity consumption, LED lights have been used. Besides, lead-free, environmentally friendly paints have been used inside and outside of the buildings. A modern sewerage treatment plant, or STP, has been incorporated to produce a contaminant-free effluent that is suitable for discharge. To save fuel, a reticulated LPG gas system has been incorporated. Besides, as an option for renewable energy, solar panels have been installed in every building. The generated electricity will be added to the on-grid systems of the buildings. Moreover, PWD have implemented similar other projects in Mirpur, Motijheel, Malibag, Tejgaon, Jhigatolaetc within Dhaka city and outside of Dhaka like in Chattogram, Noakhali etc. These projects will help proper mental and physical development of children and provide a soothing living environment of its inhabitants. As a consequence, productivity of people within the city and can contribute significantly in the GDP of our country.

Bangladesh is at risk of probable earthquake of high magnitude. It is mentionable that we have been experiencing a good number of small scale earthquakes over the last few years. To address this alarming situation and to make existing vulnerable buildings more seismic resilience, minimize economic loss and save human life PWD is very active. Though, enormous technological advancement has been achieved, still we can't predict earthquake precisely. So the best way to prepare for it is to plan an effective and expedited recovery process after the earthquake, assessment of the existing buildings and make the vulnerable building earthquake resilience. PWD is pioneer in seismic assessment and retrofit design in Bangladesh. Retrofitting can be a cost-effective way to address various issues in existing structures while extending their useful life. Retrofitting technology could be used to make a vulnerable building earthquake-resistant without demolishing. So, seismic assessment and retrofit of vulnerable buildings are also contributing significantly to ensure a sustainable and less vulnerable urban city.

PWD and JICA worked collaboratively to enrich the technical knowledge and working capacity of the engineers of PWD for seismic assessment, retrofitting design, and construction of existing RC-framed public buildings. A series of manuals and guidelines have been prepared. The engineers of PWD, with the technical assistance of the JICA expert, tried to adapt the Japanese retrofit technology to local construction conditions and practices. PWD has performed several retrofitting projects on existing buildings in Bangladesh, including the Tejgaon fire station building, the Meteorological Bhaban, Mymensingh medical, Betar Bhabanetc[4].

The long-term economic benefits of investing in resilient infrastructure are enormous. Cities become more attractive for foreign investment when they are less vulnerable to natural disasters. Additionally, resilient cities also have the edge in attracting human capital, as people prefer living in places where their livelihoods are not at constant risk. In essence, resilient urban economics is not merely a public safety measure but also a competitive advantage for cities in the global marketplace. PWD is playing a vital role to achieve the objective to ensure resilient urban economics by constructing sustainable cities.

References:

1. www.economicsobservatory.com
2. www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/, www.al-monitor.com/originals/2023/09/
3. Publication on the occasion of inauguration of "Construction of apartments for government employees at Azimpur"
4. The Project for Promotion of Building Safety for Disaster Risk Reduction (BSPP)

স্মার্ট সিটি বিনির্মাণে বাঁধা : ঢাকার অগ্নিদুর্ঘটনা

আকিব রায়হান[১], মালিহা হক[২]

শিল্প বিপ্লব এবং নগরায়নের সূচনালগ্ন থেকে উন্নয়ন ধারণাটি স্থূল অর্থে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই নির্দেশ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রবৃদ্ধি হারের ক্রম অগ্রগতি উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। উন্নয়নের সামাজিক বা পরিবেশগত সূচকগুলো ছিল উপেক্ষিত। কিন্তু ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের মধ্যেও প্রকট সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, স্বৈরশাসন, সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাগুলো উন্নয়নের ধারণাটিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে। তাই বর্তমানে উন্নয়ন শব্দটিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে 'টেকসই উন্নয়ন' শব্দটির সাথে যার রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ড। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি সুনির্দিষ্ট এবং আন্তঃসম্পর্কীয় লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যার ১১নং লক্ষ্যটি হলো টেকসই নগর ও জনপদ নিশ্চিতকরণ।

UNEP-এর মতে টেকসই নগর বিনির্মাণের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং নগরবাসীর জন্য বাসযোগ্য নগর নিশ্চিত করা। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের জিডিপির প্রায় ৮০%টি সৃষ্টি হয় নগরগুলোতে। কিন্তু যানজট, অপ্রতুল নাগরিক অবকাঠামো, পরিবেশ দূষণ, সামাজিক ও স্থানিক বৈষম্য, মহামারী, দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যাবলি টেকসই নগর বিনির্মাণে বাঁধা সৃষ্টি করছে। প্রায় দুই কোটি লোকের বসতি ঢাকা শহর নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত যার কারণে টেকসই এবং বাসযোগ্য ঢাকা তৈরি এখনও কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। Global Livability Index- অনুসারে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সূচকের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১৬৭তম অবস্থানে অবস্থান করছে মেগাসিটি ঢাকা। টেকসই ও সবুজ নগর অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হলো দুর্যোগ– বিশেষত মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ অগ্নিদুর্ঘটনা। শুধুমাত্র গত ছয় মাসেই ঢাকা শহরে বড় বড় তিনটি অগ্নিদুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে– বঙ্গবাজার, ঢাকা নিউজ সুপার মার্কেট, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট। অগ্নিদুর্ঘটনার কারণে প্রতিবছর ঢাকা শহরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সম্পদের বিনাশ ঘটে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে ২৪,১০২টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিদুর্ঘটনার ক্রমপুনরাবৃত্তি আদতে গভীর নাগরিক সমস্যার লক্ষণ মাত্র। অপরিকল্পিত নগরায়ন, অবকাঠামোগত ত্রুটি, অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, ত্রুটিপূর্ণ উল্লম্ব ও আনুভূমিক ভূমি ব্যবহার, নাগরিক অসচেতনতা ও অসাবধানতা, অপ্রতুল পূর্ব প্রস্তুতি, সুষ্ঠু নাগরিক পরিকল্পনার অভাব ও অনাগ্রহ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অগ্নিদুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণ।

নগরভিত্তিক অগ্নিদুর্ঘটনার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। সাধারণত, অপরিকল্পিত নগরায়ন বলতে বোঝায় অসমন্বিত, অপরিকল্পিত, অসম ও বিক্ষিপ্তভাবে নগর সম্প্রসারণ যা পরিবেশগতভাবে ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে টেকসই নয় । যখন একটি নগর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে ও সম্প্রসারিত হয় তখন কিছু মৌলিক জায়গায় ঘাটতি তৈরি হয়। যেমন– মাত্রাতিরিক্ত জনঘনত্ব, অপ্রসস্ত রাস্তাঘাট, আবাসিক ভবনে ও এলাকায় রাসায়নিক গুদাম এবং কারখানা তৈরি, সেটব্যাক রুল না মেনে ভবন নির্মাণ, বিকল্প ফায়ার নির্গমন পথ না থাকা, জলাভূমি ভরাট, বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন, সুয়ারেজ ও গ্যাসলাইন নির্মাণে পরিকল্পনার অভাব, ভবনগুলোতে ফায়ার হাইড্র্যান্ট না থাকা ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ঢাকা শহরে একসাথে সবগুলো মৌলিক জায়গাতেই ভয়াবহ ঘাটতি বিরাজমান। রাজধানী ঢাকার প্রায় ৭৩ শতাংশ অবকাঠামোই অপরিকল্পিত। এছাড়াও, ইউএন-হ্যাবিট্যাট এর প্রকাশনা থেকে পাওয়া গিয়েছে, ঢাকায় পাবলিকস্পেস ও রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণমাত্র ১৩.৫%। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্লানার্সের সাধারণ সম্পাদক আদিল মোহাম্মদ খানের মতে রাজধানীর ৯৫ ভাগ ভবনেই অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা নেই। ফলে একটি অগ্নিদুর্ঘটনার সময় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি অপ্রসস্থ রাস্তা দিয়ে ঢুকতে বেগ পায়, অগ্নি নির্বাপণকারী সরঞ্জাম দুর্ঘটনা স্থলে মোতায়েন করতেই ফায়ার সার্ভিসকে হিমসিম খেতে হয়। আবার, জলাধার ভরাট হয়ে যাবার কারণে আগুন নেভানোর জন্য পানি পাওয়া যায় না। দুঃখের ব্যাপার হলো ১৯৯৯ সালে ঢাকায় ১৯.৯ বর্গ কিলোমিটার জলজ ভূমি ছিল, যা ওই সময় মোট

[১]সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, [২]প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমির ১৪.২৫%। ২০২০ সালে এসে এর পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৫. ৮৭ বর্গ কিলোমিটারে, যার শতকরা হার ৪. ৮৩%। শতাংশ।

বিগত বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ডের সময়ে হাতিরঝিল থেকে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পুকুর থেকে পানি এনে অগ্নিনির্বাপণে ব্যবহার করতে হয়েছে। অথচ, সেই এলাকায় ফায়ার হাইড্রেন্টের পর্যাপ্ততা থাকলে ঢাকা ওয়াসার পানি সরবারহ করে আরো দ্রুত কাজ করা যেত। আবার, বাংলাদেশে জনবহুল বস্তিগুলোতে আগুন লাগার ঘটনা একদম চিরপরিচিত। বস্তিগুলোর নির্মাণ কাঠামো অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈধ ও অনিরাপদ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায়। বস্তিগুলো এতই ঘিঞ্জি হয় যে এর ভেতরে প্রবেশ করে আগুন নেভানো ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রচণ্ড কঠিন হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমাদের দেশে আগুন লাগার সবগুলো কারণ এক সাথে উপস্থিত। এদেশে, বৈদ্যুতিক গোলযোগের (নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে দুর্ঘটনা) কারণে ৮০ শতাংশ অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। বৈদ্যুতিক গোলযোগের পরবর্তী সময়ে অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে একসাথে সবগুলো Driving Factor কাজ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে।

উন্নয়নশীল দেশের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হিসেবে আমাদের যতটুকু সক্ষমতা সীমিত। দেশে সুউচ্চ ভবনের সংখ্যা, কল-কারখানা, অগ্নি-সংবেদনশীল স্থাপনা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়েনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের। আগুন নেভানো ও দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় উদ্ধারকারী সংস্থাটির আধুনিক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা দীর্ঘদিনের। পর্যাপ্ত জনবল নেই। সব মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফায়ার সার্ভিসের। ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডগুলো দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার সক্ষমতা থাকলেও বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সংস্থাটির সীমিত সক্ষমতা ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে আছে। আবার, অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে আমরা সেই সীমিত সক্ষমতাও কাজে লাগাতে পারছি না।

আবার, ট্যানারি শিল্পের মতো শিল্পগুলোকে ঢাকা শহরের বাইরে সরিয়ে নেয়া হলেও ঢাকা শহরের ভেতর প্রচুর রাসায়নিক কারখানা, পোশাক কারখানা আছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা)-এর সূত্রমতে, পুরান ঢাকায় আনুমানিক ২৫ হাজার রাসায়নিক পণ্যের গুদাম রয়েছে। এসবের মধ্যে ১৫ হাজারই রয়েছে বাসা বাড়িতে। এর ভেতর ২২ হাজারের বেশি গুদামই অবৈধ। ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ২০০ ধরনের রাসায়নিকের ব্যবসা চলে সেসব গুদামে। চুড়িহাট্টা বা নিমতলী ট্রাজেডির কারন ছিলো এই রাসায়নিক। জীবন বিসর্জন দিয়ে সেই এলাকার মানুষ রাসায়নিক ব্যবসায়ের দাম দিলেও দুঃখজনক বাস্তবতা হলো রাসায়নিক ব্যবসা সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া খুবই ধীর।

অন্যদিকে, রাসায়নিক আগুন নেভানো অত্যন্ত বিশেষায়িত ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আমাদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মাত্র ১৫০ জন কর্মী আছেন যারা এই ধরনের রাসায়নিক আগুন নেভানোর মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সীতাকুণ্ড দুর্ঘটনার সময়ে স্রেফ প্রশিক্ষণের অভাবেই আমাদের বীর অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অথচ, সঠিক জোনাল প্লানিং-এর মাধ্যমে যদি ঘিঞ্জি এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম ও কারখানাগুলোকে নির্দিষ্ট এবং পরিকল্পিত জায়গায় সরিয়ে নেয়া যায়, তবে এই ধরনের ট্রাজেডির সংখ্যা একদম কমিয়ে আনা যেত।

আবার, সরকার জাতীয় বিল্ডিং কোড-২০২০-এর মতো স্মার্ট বিল্ডিং কোড তৈরি করলেও দেখা যাচ্ছে সামান্য অর্থনৈতিক লোভ ও লাভের আশায় সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ তা মানছে না। আমাদের দেশে মানুষের ভেতর শুদ্ধাচারবোধ গড়ে উঠেনি। স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায় আমরা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কথা ভুলে যাই। এদেশে, চুড়িহাট্টা, নিমতলী প্রতিটি দুর্ঘটনার পেছনে মানুষের লোভ ও দুর্নীতির ফলে সৃষ্ট অপরিকল্পিত নগরায়নই দায়ী। সরকার সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে পৌরসভা ও উপজেলা পর্যন্ত মাস্টারপ্লান করে নগরায়নকে স্মার্ট করার মিশন হাতে নিয়েছে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের মানুষই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাস্টারপ্লানের বাইরে যেয়ে কাজ করছে।

বর্তমান সময়ে, স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জাতি গঠনই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্পকে মাথায় রেখে তাই আমরা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলের অগ্নিঝুঁকি কমাতে বেশ কিছু উপায় ভেবেছি।

- **বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন :** জাতীয় বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে অগ্নিঝুঁকি সহসাই কমে আসবে এবং বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে নির্মাণকৃত ভবন মালিকদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারলে ও বিল্ডিং কোড লঙ্ঘনের সাথে জড়িত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি কঠোর ভাবে দমন করতে পারলে সহসাই আমাদের শহরগুলো স্মার্ট শহরে পরিণত হবে।
- **অগ্নি-সহনশীল ভবন নির্মাণ :** ভবনগুলোর নির্মাণ উপকরণ পরিবেশ বান্ধব ও অগ্নি-সহনশীল হলে অগ্নিঝুঁকি এমনিতেই কমে আসে। এছাড়া, ভবন ও রাস্তার পাশে কিছুদূর পর পর ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে ফায়ার হাইড্রেন্ট তৈরি করতে পারলে প্রয়োজনের সময় দ্রুত পানি পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া, ভবনগুলোতে অগ্নি প্রতিরোধি সেন্সর ব্যবহারে ওঙঞ উবারপব-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ভবনের অংশীজনকের কাছে সতকর্তা সংকেত পৌঁছানো ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অগ্নিঝুঁকি কমানো সম্ভব।
- **এলাকাভিত্তিক প্লানিং ও জোনিং :** আবাসিক এলাকা থেকে কলকারখানা ও রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে পৃথক অঞ্চলে নেয়ার জন্য দরকার এলাকাভিত্তিক প্লানিং ও জোনিং। তাছাড়া, রাস্তাঘাট চওড়া করার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন ও সরঞ্জাম অবাধে চলাচলের জন্যও

দরকার সঠিক পরিকল্পনা। যানবাহনের চেসিসের প্রস্থের সাথে মিলিয়ে দরকারে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ঘিঞ্জি এলাকায় নতুন করে রাস্তা নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি এলাকার জনবসতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা আলাদা। তাই, GIS প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি এলাকার জন্য এলাকা-নির্দিষ্ট জোনিং করা খুবই জরুরি। একই সাথে, সেই প্লানিং ও জোনিং বাস্তবায়নের জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

- **সেটব্যাক রুলের বাস্তবায়ন :** দুটি ভবনের মাঝে পর্যাপ্ত জায়গা রাখাকে সোজা বাংলায় বলা যায় সেটব্যাক রুল। দুটি ভবনের মাঝে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে আগুন সহজে ছড়িয়ে পড়বে না এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাবে।

- **জলাভূমি রক্ষা :** সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সবুজ ভূমি ও জলাভূমি দখলমুক্ত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলাভূমির নৈকট্য থাকলে অগ্নিদুর্ঘটনার সময় আগুন নেভানোর জন্য পানি সহজলভ্য হয়।

- **স্মার্ট স্বেচ্ছাসেবক দল নির্মাণ :** স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষ জন। কাউকে বাঁচাতে সারা দুনিয়ায় আশপাশের মানুষেরাই সবার আগে এগিয়ে যান। তুরস্কে সদ্য সাম্প্রতিক ভূমিকম্পেও সেটা ঘটেছে। সাভারের রানা প্লাজাতেও আমরা সেটা দেখেছিলাম। সাভারের পর একটা ভাবনা ঘুরপাক খেয়েছিল সমাজের বা কমিউনিটির এ সদা প্রস্তুত শক্তিকে কীভাবে আমরা ভিড় নয়, বরং কার্যকর এক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। আমাদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় বেসামরিক প্রতিরক্ষা বা সিভিল ডিফেন্স দল গড়ে তোলা। তুরস্কের হোয়াইট হেলমেট দল সে রকমই এক সিভিল ডিফেন্স দল। এই দল সারা পৃথিবীতে উদ্ধার কাজ চালানোর শক্তি রাখে।

- **স্মার্ট ফায়ার সার্ভিস তৈরি :** আধুনিক ড্রোন, ফায়ার ফাইটিং রোবট, অগ্নিনিরোধী ফায়ার ফাইটিং পোশাক, বর্ধিত জনবল, যানবাহন ও নিত্যনতুন State of the Art সরঞ্জাম নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের চেষ্টা করতে হবে ফায়ার সার্ভিস যাতে সর্বোচ্চ আধুনিক হয়। তাছাড়া, GIS-এর মাধ্যমে Suitable Location Analysis করে আরো বেশি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এবং অগ্নিদুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সাড়াদানের সময় কমিয়ে আনা যায়।

- **ঝুঁকি নিরুপণ :** ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সনাক্তকরণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও পূর্বের অগ্নিদুর্ঘটনা প্রবণতা বিবেচনা করা করে ঝুঁকি নিরূপণ করে সে অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা যায়।

- **ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা ও ব্যবহার করা :** প্রতিটি ভবনেই অগ্নিনির্বাপণ সিলিণ্ডার বা ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকাটা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে এগুলো ব্যবহার করতে জানতে হবে ভবনের বাসিন্দাদের। আগুন লাগার পর প্রথম দুই মিনিটকে বলা হয় প্লাটিনাম আওয়ার বা সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই সময়ে ঘাবড়ে না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমানো যায় ।

- **নিয়মিত মহড়া :** প্রতিটি বড় ভবনের বাসিন্দা ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয়ে কর্মরতদের সবাইকেই জানতে হবে যে, ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আগুন লাগলে কিভাবে ফায়ার সার্ভিসকে ডাকতে হবে। ভবনে আগুন লাগলে সেখান থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে হবে তার জন্য নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ২০০৬ সালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিএসইসি ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগার পর ওই ভবনের ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। তাঁদের ছাদ থেকে নিরাপদে নামিয়ে এনেছিল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এর কারণ হলো, তারা ইতোপূর্বে যথাযথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাজরীন ফ্যাশন, সেজান জুস দুর্ঘটনার সময় যদি শ্রমিকদের এই জ্ঞান থাকতো তবে আমরা হয়ত এত প্রাণহানি দেখতাম না।

- **ঋতুভিত্তিক পরিকল্পনা :** বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ট্রেন্ড বিবেচনায় দেখা যায় যে অগ্নিকাণ্ড এপ্রিলে সবচেয়ে বেশি, জুলাইয়ে সবচেয়ে কম ঘটে। অর্থাৎ, গ্রীষ্মকালীন সময়ের অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই স্বেচ্ছাসেবক দলকে স্ট্যান্ডবাই রাখতে পারলে ও সে অনুযায়ী স্মার্ট অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম কিনতে পারলে গ্রীষ্মকালে ঘটা অগ্নিকাণ্ডের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমাদের আশাবাদ হলো, স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিকদের শহর হবে স্মার্ট। স্মার্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে বাংলাদেশে অধিকাংশ অগ্নিদুর্ঘটনা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়াও, অগ্নিনির্বাপণের চেয়ে আগুন যাতে না লাগে সেদিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য চাই উন্নত নগর ব্যবস্থা। উন্নত নগরে আইন মেনে ভবন নির্মাণ করলে ও যথাযথ অগ্নিপ্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকলে অগ্নিদুর্ঘটনা কমে আসবে। সবচাইতে বড় কথা হলো, স্মার্ট নাগরিক হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনেও আরো স্মার্ট হতে হবে।

Resilient Urban Economy through Industrial Symbiosis: A Special Focus on Dhaka City

Zannatul FerdousTithi, Rihana Parvin, Nipa and Nishat, Tasnim Sumaya*

Introduction

The concept of resilient urban economies has received a lot of attention in an era of rising urbanization and increasing global concerns. Cities all across the world are always looking for new ways to improve their sustainability, adaptability, and economic robustness. One well-known example is "Industrial Symbiosis." Industrial Symbiosis is a paradigm shift in urban planning and economic development that strives to create more resilient and sustainable urban economies. It is a concept founded on circular economy and resource efficiency principles. At its core, industrial symbiosis aims to maximize resource utilization, eliminate waste, and promote collaboration among various companies within an urban environment. Girard (2014) characterized the model with environmental high-tech industries, networks of small and medium-sized businesses, and production of new goods and services with little environmental impact through recycling and reusing waste, materials, water, and other resources, which lowers the demand for resources and energy. This is how, the model takes on the synergistic, circularization and symbiosis processes as tools to multiply bonds.

Industrial Symbiosis by 4R Model

Industrial symbiosis is a system approach to a more sustainable and integrated industrial system (Chertow and Ehrenfeld, 2012), which identifies business opportunities that leverage under-utilized resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.). Industrial symbiosis has also been seen as a practical approach to “enhance resource efficiency, reduce waste generation and GHG emissions via material, energy, by-products exchange between different processes and industries” (Sun et al., 2017), and thus has been included at the core of strategies to promote the transition towards the Circular Economy, through promoting flows of resources through multiple cycles across different sectors of activities and supply chains. Industrial symbiosis is a related concept that tries to create a closed-loop system in which waste from one industry becomes a resource for another. Industrial symbiosis can be viewed as an extension of the 3R principle, which includes recovering resources from waste streams. The goal of industrial symbiosis through circular economy can be achieved by proposed 4R mechanism.

The 4R concept is a cornerstone of the circular economy. Reduce, reuse, recover and recycle stands for 4R concept which associate with the production, consumption, end of product and treatment in industry. The "Reduce" concept encourages industries to minimize resource use, waste generation, and environmental impacts during the production process. The “Reuse” concept relates with the consumption of goods by repeatedly. By the end of the product, reprocessing of the used product can be illustrated as “recycling”.

*MS Research Scholars, Session 2021-2022, Department of Geography and Environment, University of Dhaka.

Different types of treatment plant can be used for “recovery” process for allocating the resources properly (Figure 1).

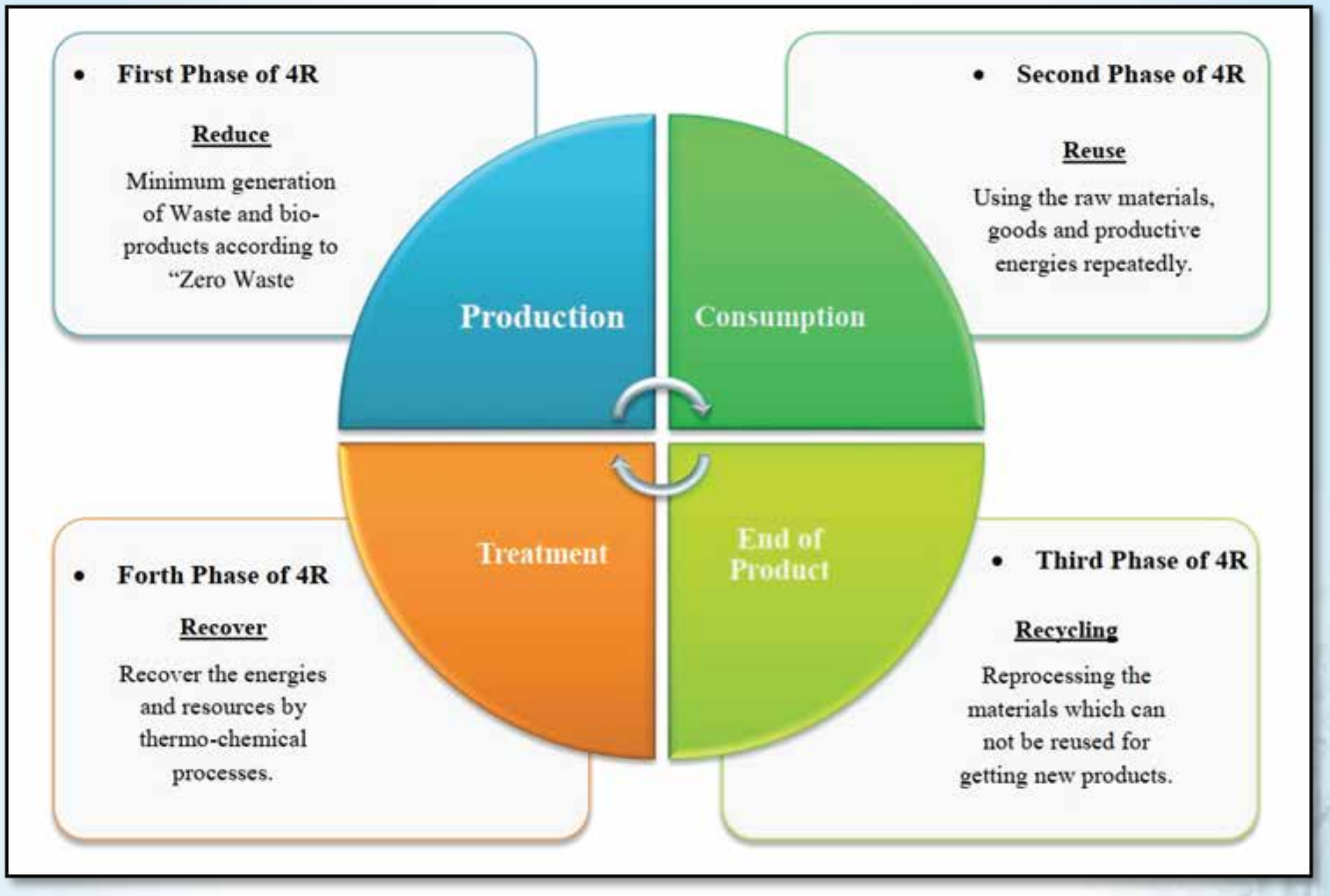

Figure 1: Proposed Regenerative for Industrial Symbiosis by 4R Model

The circular economy's purpose is to keep resources in use for as long as possible, reducing waste and pollution. The 4R concept is a method of accomplishing this goal by minimizing trash generation, reusing items and materials, and recycling them at the end of their useful life. The 4R idea is an expansion of the 3R paradigm that involves recovering resources from waste streams.

Urban Resilient Economy by 4R Model

Within the context of sustainable development, an urban resilient economy refers to a city's ability to maintain economic stability and prosperity while effectively adapting to and recovering from various shocks, stresses, and challenges, such as those related to environmental sustainability and climate change. This concept emphasizes the integration of economic resilience with long-term development objectives, supporting a balance of economic growth, social equity, and environmental stewardship. Integrating industrial symbiosis with sustainable development and the establishment of an urban resilient economy can be an effective strategy for creating environmentally, socially, and economically sustainable cities.

The 4R model, which stands for "Reduce, Reuse, Recycle, and Recover," is an extended and more

comprehensive framework for managing resources and waste in an environmentally responsible manner. Integrating the 4R model into industry can play a significant role in promoting an urban resilient economy by addressing resource efficiency, waste reduction, and environmental sustainability. The 4R model's relation to an urban resilient economyis explained below.

a. Resource Efficiency (Reduce)

- Resource Conservation: Industries become less dependent on resources, enhancing resilience to scarcity and price fluctuations.
- Economic Resilience: Reducing waste and operational costs bolsters economic resilience.

b. Waste Minimization (Reuse, Recycle, and Recover)

- Reuse of Materials: Encourages material reutilization, cutting costs and reducing reliance on new resources.
- Recycling: Conserves natural resources, lowers environmental impact, and reduces industry's footprint.
- Waste Recovery: Creates new revenue streams, boosting economic resilience.

c. Environmental and Climate Resilience

- Reduced Environmental Impact: Lowers pollution, emissions, and energy use, fostering a healthier environment.
- Mitigating Climate Change: Sustainable practices aid climate change mitigation, reducing risks from extreme weather events.

d. Local Economic Development

- Job Creation: Establishing recycling and recovery facilities generates jobs, supporting local economies.

e. Community Resilience

- Less Environmental Impact: Cleaner and safer environments benefit local communities, bolstering resilience.

f. Policy and Governance

- Supportive Regulations: Local governments can enact policies encouraging 4R practices, aligning with urban resilience goals.
- Incentives for Resilience: Governments can incentivize industries adopting the 4R model, fostering resilient urban economies.

The 4R model offers a holistic approach to resource and waste management, enhancing sustainability and resilience. It reduces resource dependence, minimizes waste, and promotes circular economy practices, benefiting urban areas and industry's economic and environmental performance.

By reducing resource dependency, minimizing waste, and adopting circular economy practices, industries can contribute to the overall resilience of urban areas while simultaneously improving their own economic and environmental performance.

a. Textile and Garment Industry:

- Dhaka's textile and garment industry can optimize resources through collaboration with nearby dyeing facilities, reducing water and energy use.
- Dyeing units can reuse treated wastewater, cutting freshwater use and curbing pollution.
- Waste heat can benefit neighboring industries or residential areas.

b. Food Processing and Agriculture:

- Collaboration with local farmers ensures a fresh supply of raw materials for food manufacturers.
- Food waste can fuel nearby biogas plants for renewable energy.

c. Construction and Demolition Waste Management:

- Recycle construction waste like concrete and bricks for new projects.
- Partnering with waste recycling companies reduces demand for new materials and waste generation.

d. Renewable Energy and Waste Management:

- Combine renewable energy production with waste management for a sustainable approach.
- Excess renewable energy can power waste-to-energy plants, converting waste to electricity or heat.

e. Information Technology (IT) and Electronics:

- IT and electronics industries can collaborate to recycle and refurbish electronic devices, reducing e-waste and extending product lifecycles.

f. Chemical Manufacturing and Water Treatment:

- Partner chemical manufacturers with water treatment plants to enhance processes for cleaner discharges.

Special Focus on Dhaka City

Dhaka is the capital and largest city in Bangladesh. According to Dhaka's economy is the largest in Bangladesh, providing $213.3 billion in nominal gross state product and $740 billion in purchasing power parity terms as of 2022. Dhaka's economy accounts for 40% of Bangladesh's GDP.The city serves as a main financial hub. Creating industrial symbiosis by 4R mechanism can enhance the quality, profit maximization and sustainability more.

Industrial symbiosis is a valuable concept that can be applied across various industries in urban areas, including Dhaka, Bangladesh, to promote resource efficiency, reduce waste, and enhance economic and environmental sustainability. The following discussion includes a few instances of industrial symbiosis in several Dhaka-based industries.

An Illustration of Plastic Recycling and Packaging in Dhaka City

Plastic waste is a significant concern in Dhaka. Plastic recycling facilities can collaborate with different types of manufacturing company to source recycled plastics for their materials.

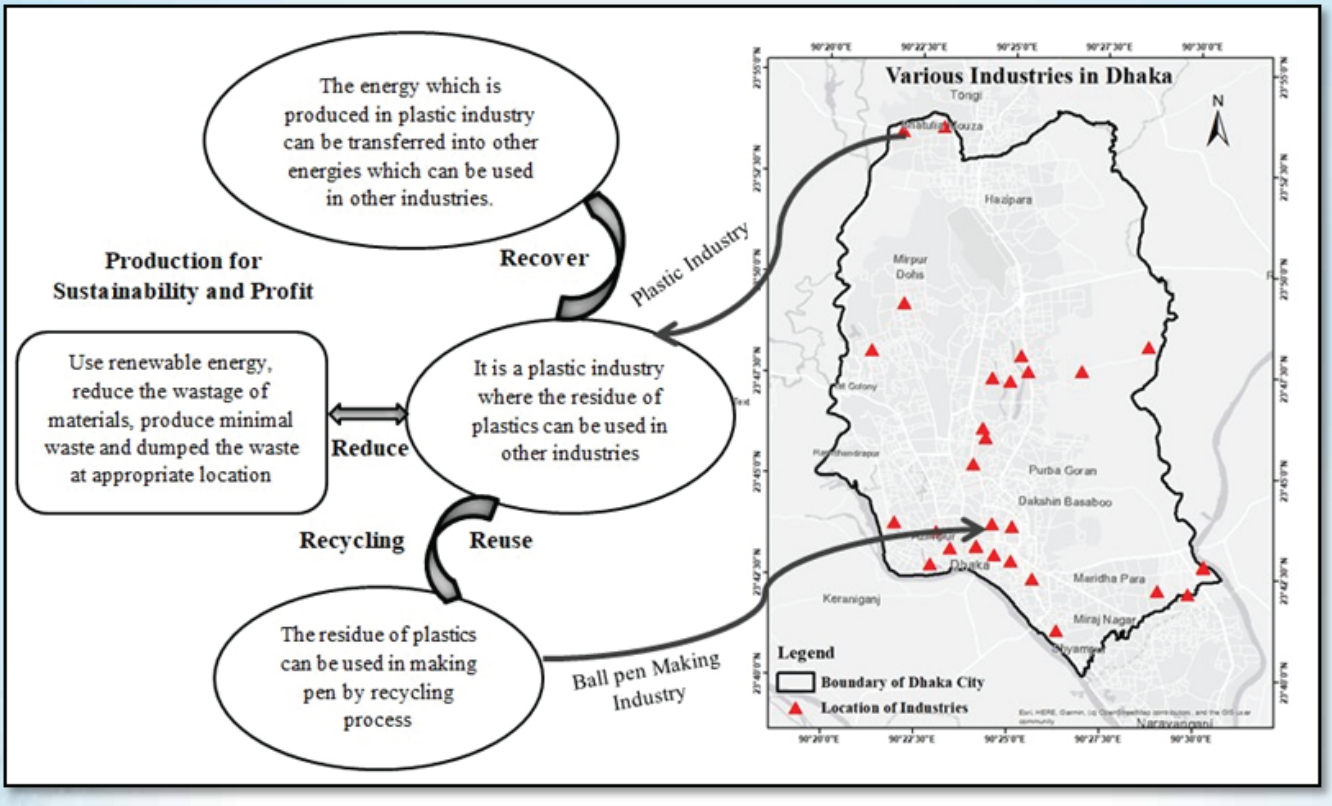

Figure 2: Industrial Symbiosis forthe Production of Ball Pen from Plastic Waste Applying the 4R Concept

For example, plastic industries in Dhaka produce more wastage. Firstly they should produce low amount of waste and the plastic products can be used repeatedly by reusing mechanism. The scraps and waste which cannot be recycled or reused should dumb in appropriate dumping spot (Figure 2).

This circular process can make more resilient economic condition in Dhaka city. By 4R mechanism the expenditure will be decreased and profit will be increased by increasing production which makes the economy more resilient.

Figure 3: Integration of Different Concepts for Resilient Urban Economy

Implementing industrial symbiosis in Dhaka, the capital of Bangladesh, can significantly contribute to sustainable development and the creation of an urban resilient economy (Figure3). The following sections discuss how industrial symbiosis can be incorporated into the city's development plans to address these issues.

a. Sustainable Development in Dhaka

- Resource Efficiency: Encourage industries in Dhaka to adopt resource-efficient practices by reusing, sharing, and recycling materials and resources.
- Environmental Stewardship: Promote cleaner production processes and reduce pollution and emissions in industries through the collaborative exchange of resources and environmental best practices.
- Economic Prosperity: Foster collaboration and networking among industries, which can lead to increased economic opportunities, job creation, and the growth of local businesses in Dhaka.
- Social Equity: Ensure that the benefits of industrial symbiosis initiatives reach all segments of Dhaka's population, particularly vulnerable communities residing in industrial areas.
- Innovation and Technology Transfer: Facilitate the sharing of innovative technologies and knowledge among industries to improve overall competitiveness and contribute to sustainable development goals.

b. Urban Resilient Economy in Dhaka

- Resource Diversification: By sharing resources and materials within industrial symbiosis networks, Dhaka's industries can diversify their resource supply, reducing dependence on centralized and vulnerable supply chains.
- Waste Reduction: The reduction of waste generation through industrial symbiosis aligns with the city's efforts to manage waste effectively, especially in densely populated areas.
- Economic Stability: Collaboration among industries enhances economic stability, as they can support each other during economic downturns or supply chain disruptions, contributing to Dhaka's urban resilience.
- Local Economic Development: Industrial symbiosis initiatives can stimulate local economic development and provide opportunities for Dhaka's residents to access jobs and services within their communities.
- Emergency Preparedness: Dhaka's industries can collaborate in disaster preparedness and response efforts by sharing resources and expertise, improving the city's overall resilience to natural and man-made disasters.
- Infrastructure Resilience: Collaborative use of infrastructure within industrial symbiosis networks can reduce the risk of infrastructure failures during emergencies, ensuring continuity of operations.
- Energy Efficiency: Sharing excess energy and heat between industries can lead to energy savings and greater resilience to energy supply disruptions.

c. Key Strategies for Implementing Industrial Symbiosis in Dhaka

- Industrial Clusters: Identify and promote industrial clusters or zones where industries with symbiotic potential can co-locate and collaborate.
- Policy and Regulation: Enact supportive policies and regulations at the local and national levels to incentivize and facilitate industrial symbiosis initiatives in Dhaka.
- Capacity Building: Provide training and support to industries to encourage their active participation in industrial symbiosis activities.
- Community Engagement: Involve local communities, stakeholders, and NGOs in the planning and development of industrial symbiosis initiatives to ensure that social and environmental benefits are maximized.

Conclusion

The integration of industrial symbiosis with sustainable development and the creation of an urban resilient economy can offer multiple benefits for cities and industrial sectors. Industrial symbiosis involves the collaborative and mutually beneficial exchange of resources, materials, energy, and expertise among different industries or organizations.

In Dhaka, where urban growth and industrialization are rapidly intensifying, industrial symbiosis can help balance economic development with environmental sustainability and resilience. Adopting the 4Rs can help industrial companies save money on waste removal and treatment while also contributing to environmental sustainability.The 4R idea is basic to the progress of a round economy. By lessening waste and contamination, we can make a more reasonable future for us and people in the future.

Acknowledgement

The authors express deep gratitude and appreciation to Professor Dr. Kazi Md. Fazlul Haq for invaluable guidance and unwavering support which plays a pivotal role in shaping the direction of this endeavor. His insightful feedback and meticulous review of the working process have significantly enriched the quality and depth of the work.

Reference

Domenech, T., Bleischwitz, R., Doranova, A., Panayotopoulos, D. and Roman, L., 2019.Mapping Industrial Symbiosis Development in Europe_ typologies of networks, characteristics, performance and contribution to the Circular Economy. Resources, conservation and recycling, 141, pp.76-98.

Godschalk, D.R., 2003. Urban hazard mitigation: Creating resilient cities. Natural hazards review, 4(3), pp.136-143.

Kennedy, C., J. Cuddihy, and J. Engel–Yan. 2007. The changing metabolism of cities. Journal of Industrial Ecology 11(2): 43–59

Peter Karl Kresl. (2014). Urban Economy.Economies, 2(4), 218–219.

Remøy, H., Wandl, A., Ceric, D. and Timmeren, A.V., 2019.Facilitating circular economy in urban planning.Urban Planning, 4(3), pp.1-4.

Rose, A. 2007. Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards 7(4): 383–398

Sun, L., Li, H., Dong, L., Fang, K., Ren, J., Geng, Y., Fujii, M., Zhang, W., Zhang, N. and Liu, Z., 2017. Eco-benefits assessment on urban industrial symbiosis based on material flows analysis and emergy evaluation approach: A case of Liuzhou city, China. Resources, Conservation and Recycling, 119, pp.78-88.

Taddeo, R., Simboli, A. and Morgante, A., 2012. Implementing eco-industrial parks in existing clusters.Findings from a historical Italian chemical site. Journal of Cleaner Production, 33, pp.22-29.

Wen, Z. and Meng, X., 2015. Quantitative assessment of industrial symbiosis for the promotion of circular economy: a case study of the printed circuit boards industry in China's Suzhou New District. Journal of Cleaner Production, 90, pp.211-219.

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় আবাসন ও পরিবেশ ভাবনা

মোহাম্মদ নূর হোসেন খাঁন[১]

স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজের পতাকার যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশকে নতুন স্বপ্ন দেখাতে নতুনভাবে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়- বাংলাদেশের উন্নয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা কীভাবে খুঁজে বের করা যায় এবং কীভাবে তার টেকসই বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেসব বিষয়ে তিনি শুধু দেশের নয়, দেশের বাইরেও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কর্মপরিকল্পনা ও মতামত গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন বাংলার মাটি, মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতিকে। নিজস্ব উপলব্ধি থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জুন মাসের এক ভাষণে বলেছিলেন, দেশের প্রতিটি মানুষ খেতে পাবে, আশ্রয় পাবে। বলেছিলেন, প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। আর এটি ছিল তার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে উঠে আসে গ্রামের পরিবেশ, কৃষি ও প্রকৃতি। আর সেইসঙ্গে কৃষকের কথা। নিজস্ব সংস্কৃতির স্থাপত্য ও পরিকল্পনাকে বুঝতে হলে প্রয়োজন এই সবকিছুর সমন্বয়। তিনি সর্বস্তরে বৃক্ষরোপণের ডাক দিয়েছিলেন, উপকূলীয় বনায়ন করেছিলেন, বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন প্রণয়ন করেছিলেন, জলাভূমি রক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করে বহুমুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল সুস্থ এবং পরিবেশবান্ধব সমাজব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে টেকসই নগর এবং গ্রাম উন্নয়নের ভাবনা, পরিবেশ-প্রকৃতিগত ভাবনার বিভিন্ন রূপরেখা ব্যক্ত করেছেন। গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অনেক আগেই তার 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন, সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মাতৃসদন, কৃষি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলার মাঠ, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, মজবুত ঘরবাড়ি প্রভৃতির কথা। সেইসঙ্গে বলেছেন– নদনদী, খাল-বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে খামার তৈরি, সর্বোপরি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কুটির শিল্পের মানোন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশ। তার শৈশবের সমস্ত স্মৃতিজুড়েই রয়েছে গ্রামের সহজ-সরল প্রকৃতি আর পরিবেশ। তিনি বলেছেন, 'গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।' বর্তমানেও তিনি তার বিভিন্ন বক্তব্যে-চিন্তায় শহরের টেকসই উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত গ্রাম এবং নগর উন্নয়নের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ আমরা সব সময়ই তাদের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোকপাত করি। কিন্তু এর সঙ্গে তাদের নগরায়ন, শিল্পায়ন, গ্রামোন্নয়ন, স্থাপত্য, পরিবেশ ভাবনা নিয়ে তাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশকে আরও নিবিড়ভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া প্রয়োজন। আর এভাবেই যদি আমরা গবেষণার মাধ্যমে সমন্বিত গ্রাম এবং শহরের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে পারি এবং সেভাবে স্থাপত্য চর্চা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে আরও টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে সেটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '২০২৫ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারে অন্যতম লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ১১তম হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত, সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা। এসডিজির লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের সব উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আবাসন খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। নগরীতে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের জন্য আশ্রায়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলাভূমি রক্ষা করে পরিকল্পিত নগরায়ন সৃষ্টিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা আমাদের মহান সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। নাগরিকদের এসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং করছে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা ২১২০ কিলোক্যালরি নিশ্চিত করতে যেমন সরকার খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, তেমনি চিকিৎসা ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবছর বিনিয়োগ করছে বিশাল অংকের টাকা। একইসাথে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেও সরকার প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে আবাসন খাতে। শহর ও শহরতলীতে নাগরিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানে নিরন্তন

[১] প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

কাজ করে যাচ্ছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থাসমূহ। এর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ঘোষণা "সবার জন্য আবাসন, কেউ থাকবে না গৃহহীন" এবং টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য সামনে রেখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হওয়া উচিত এবং অক্টোবরের প্রথম সোমবারটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। দিবসটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয় এবং দ্রুত নগরায়নের সমস্যা এবং পরিবেশ এবং মানব দারিদ্র্যের উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে দিবসটি পালন ও আয়োজন করা হয়। এই বছর, আরবান অক্টোবর কার্যক্রম শুরু হবে ২ অক্টোবর বিশ্ব বসতি দিবস। বিশ্ব বসতি দিবসের উদ্দেশ্য হল আমাদের শহর ও শহরগুলির অবস্থা এবং পর্যাপ্ত আশ্রয়ের সকলের মৌলিক অধিকারকে প্রতিফলিত করা। বিশ্ব বসতি দিবস ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৪০/২০২ রেজোলিউশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিনটি বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও তৈরি করা হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই শহর ও শহরগুলির ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রয়েছে। ১৯৮৬ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে বিশ্ব বসতি দিবসটি প্রথম উদ্‌যাপিত হয়েছিল এবং সেই বছরের জন্য নির্বাচিত থিমটি ছিল "শেল্টার ইজ মাই রাইট"। এটি অক্টোবরের প্রথম সোমবার হয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হতে থাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি রয়েছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং মধ্য আমেরিকাতে এই ঝুঁকিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে হাইতি, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, এল সালভাদোর এবং বলিভিয়ার মতো দেশগুলি দারিদ্র্যের উচ্চ স্তরের এবং যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বৈচিত্র্যের কারণে তাদের শহরগুলি ব্যতিক্রমীভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উচ্চ স্তরের জনসংখ্যার ঘনত্ব, দুর্বল বিল্ডিং কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়ে উঠেছে নানান শহরগুলিতে যার যথাযথ অবকাঠামো নেই, কোনো সম্প্রদায় সংগঠন নেই এবং কার্যকালীন সুরক্ষা নেই। যে কোনো ধরনের বিপর্যয় ঘটলে, একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রচুর প্রাণহানি ঘটে।

সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগত দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সে আলোকে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল, 'আমার গ্রাম, আমার শহর'। এর মাধ্যমে শহরের সব নাগরিক সুবিধা তথা আবাসন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ অন্যান্য নগরের সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায় সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের জেলা শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্লট ও ফ্ল্যাট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গ্রাম পর্যায়েও পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিতে মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করা হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সারাদেশে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও সমন্বয় করে যাচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা "গ্রামের মানুষকে শহরের সুবিধা প্রদান করা" বস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ মন্ত্রণালয়।

শুধু সরকারের উদ্যোগে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নাগরিকের বাসস্থান নিশ্চিতে বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবাসন ব্যবস্থা যেন সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠনগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে। সরকার 'রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছে। আবাসন ব্যবসায়ীদের সরকারের আবাসন নীতিমালা মেনে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে বৈধ নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করতে হবে। এ ছাড়া সুপরিকল্পিত, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ভবন নির্মাণে তাদের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের চাহিদা বিবেচনায় রেখে ৮০০/১০০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট নির্মাণে বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগী হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর নগরায়ন-গ্রামোন্নয়নের ভাবনা, স্থাপত্য এবং পরিবেশ ভাবনা– এ সম্পর্কে আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন অবশ্যই। এজন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র জাতীয় 'বঙ্গবন্ধু গ্রাম ও নগর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র' কিংবা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শুধু বাস্তবায়িত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যাকে তিনি বলতেন 'সোনার বাংলা'। আশা করছি, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য এ বিষয়ে অচিরেই গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

বাংলাদেশ আজ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উন্নীত হবে। উন্নয়নের এ প্রেক্ষাপটে ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'সবার জন্য আবাসন/কেউ গৃহহীন থাকবে না' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য স্মার্ট নগরায়ন ও আবাসন

এ কে এম এ হামিদ[১]

সৃষ্টির আদিযুগ থেকে প্রাণীকুলের অংশ হিসেবে মানবজাতি ঝোঁপ-জঙ্গলে সহস্র কোটি বছরে বসবাসের ধারাবাহিকতায় খাদ্য সংকট মোকাবেলার তাগাদা থেকে কৃষি উৎপাদন নির্ভর বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের সূচনা ঘটে। এই সূচনায় প্রায় দশ হাজার কোটি বছর পূর্বে মানুষ একত্রে বসবাসের জন্য গৃহ তৈরির যাত্রা শুরু করেছিল। সেই থেকে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকতায় গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে বর্তমানে সমাজরাষ্ট্রে গৃহ বা বাসস্থান মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকারের অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে 'সবার জন্য গৃহ' প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বসভ্যতায় গৃহ বা বাসস্থান শুধুমাত্র মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবেই নয়, বরং সামাজিকভাবে ব্যক্তির জীবনবোধ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়ন-উৎপাদনের প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধির অনুপ্রেরণা তথা ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়ন সমৃদ্ধির উৎসস্থল হিসেবেই বিবেচ্য।

একটি গৃহ বা বাসস্থান যেমন ব্যক্তি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনিভাবে সমষ্টির উন্নত আবাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সমৃদ্ধির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। একই ধারাবাহিকতায় দেশের সমগ্র জনগণের জন্য পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে স্মার্ট নগরায়ন এবং উন্নত-সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে দেশ ও এর নাগরিকগণ।

২০২৩ সালের বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "Resilient Urban Economies. Cities as Drivers of Growth and Recovery", যা বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় "স্থিতিশীল নগর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে টেকসই নগরসমূহই চালিকাশক্তি" প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশে বিশ্ব বসতি দিবস পালন করছে।

এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য-১১ এ টেকসই নগর ও জনপদের কথা বলা হয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বাসস্থান বা নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত আবাসস্থল নির্মাণ করা এখন সময়ের দাবি। স্বল্প ভূমির জনবহুল এদেশে "সকলের জন্য গৃহ" কর্মসূচি বাস্তবায়ন সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা ব্যতিত কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০২৩ সালে বৈশ্বিক জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই নগর ও শহরে বসবাস করবে। বাংলাদেশও আগামিতে একই রূপ ধারণ করবে। কেননা এদেশেও জিডিপি'র ৬০-৬৫ শতাংশ আসে শহরাঞ্চল থেকে। অচিরেই তা ৮০ শতাংশ উন্নীত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান বাস্তবতায় দ্রুত নগরায়নের ফলে আধুনিক নগর জীবনব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীল নগর অর্থনৈতিক কর্মব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে।

বাংলাদেশের ন্যায় দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ন ও নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ বিবেচনায় নগর অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টতই বলা আছে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে-পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ সাধন। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং পরিবেশের যত্ন নিতে হবে। কেননা, জনগণের কার্যক্রমে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এটি স্পষ্ট যে, শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রযুক্তিবিপ্লব, সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ভোগসর্বস্ব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্যপীড়িত অর্থনীতির কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ও জীবনমানে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব তারই একটি উদাহরণ হতে পারে, যেখানে অপরিকল্পিত নগর অর্থনীতি বহুলাংশে দায়ী। তাই, প্রাকৃতিক পরিবেশের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পৃথিবীকে কিভাবে বাসযোগ্য নগর অর্থনীতির বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা যায়, সে বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। বস্তুত নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এখন আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে পৃথিবীর সম্পদরাশি ও সম্পদের উৎস যেমন সীমাবদ্ধ, তেমন তার দূষণ সহ্য করার ক্ষমতাও অসীম না।

---

[১]উন্নয়ন গবেষক ও সভাপতি, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)

সমাজবিজ্ঞানী মিচেলের মতে, নগরায়ন হচ্ছে শহুরে হওয়ার পদ্ধতি, যা কৃষি পেশা থেকে অকৃষি পেশার রূপান্তর এবং মানুষের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিবর্তন। আরেক সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারেন এস. থমসনের মতে, নগরায়ন হচ্ছে কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের অকৃষি কার্মকাণ্ড স্থানান্তর প্রক্রিয়া। জাতিসংঘ রিপোর্টে নগরায়নের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ শহরে বসবাস করার প্রক্রিয়াই হলো নগরায়ন। স্থিতিশীল বা টেকসই নগর উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নগর অবকাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট শহর পরিকল্পনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, পরিকল্পিত আবাসন, পয়ঃ ও সুয়্যারেজ ব্যবস্থাপনা, সুপেয় পানি সরবরাহ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সেবা ইত্যাদি কিছু মৌলিক বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

এই মৌলিক নিশ্চয়তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অভীষ্ট লক্ষ্য-১১ এ বলা আছে-২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন; অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, অসমর্থ (প্রতিবন্ধি) ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন ব্যবস্থার প্রসার ও অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার, বায়ুর গুণাগুণ এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্যব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে নগরসমূহের মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনা, সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করতে হবে।

একথা বলা যায়-মানুষের লোভ ও তথাকথিত উন্নয়নের যে কোন প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হলো কম বেশি পরিবেশ দূষণ। আধুনিক উন্নয়নের নামে কল-কারখানা বাড়লে তাতে বায়ু দূষণ যেমন বাড়বে, তেমনি হ্রাস পাবে প্রাকৃতিক সম্পদ। তাই বলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাবে, সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়ন দর্শন অনেকটা শহরভিত্তিক, আয়ভিত্তিক ও ভোগ ভিত্তিক হওয়ায় এ ধরনের উন্নয়নের কুফল পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে নিচ্ছে। প্রকৃতির নির্মমতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে এখন মানুষ উন্নয়ন বলতে বুঝে বড় বড় অট্টালিকার শহর নির্মাণ, শপিং মল, চকচকে বাড়ি, ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি বা চাতুর্যপূর্ণ নগরকে। উন্নয়নের এ ধারণাটি অর্থনৈতিক সম্পর্কিত বিধায় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল জাতিরাষ্ট্রগুলো এ ধরনের উন্নয়নে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে থাকে। এ ধরনের উন্নয়ন ধারণা বাস্তবিক অর্থে অনগ্রসরতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যথার্থই বলেছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসাম্য ও তার থেকে উদ্ভূত বৈষম্য কল্যাণমূলক অর্থনীতির দর্শন হতে পারে না। যা স্থিতিশীল উন্নয়নের অন্তরায়। এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো মূল পুঁজিপতিদের লাভের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত হয়। কিন্তু স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়। বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবার লক্ষ্যে অনেকগুলো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়টি মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ তার মধ্যে অন্যতম। এ ধরনের প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব ইতোমধ্যে দেশীয় প্রকৃতি পরিবেশের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাড়ছে তাপমাত্রা। জৈব বৈচিত্র্যের বিরূপ প্রভাবে আম, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারির ন্যায় দেশীয় ফলজ উৎপাদন ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ। অন্যদিকে মাত্রারিক্ত মোবাইল টাওয়ার নগরায়নে ক্যান্সারের মতো ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। পানির প্রাকৃতিক উৎস ধ্বংস করে ক্রমবর্ধমান নগর বিকাশ ও শহুরে মানুষের চাহিদা বিবেচনায় ভূ-গর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন দেশকে ক্রমান্বয়ে মরুপ্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে নগর বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করতে পারায় সৃষ্টি হচ্ছে বায়ু দূষণ, যা জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিষয়টি স্থিতিশীল নগায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়।

নগর অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, স্থানীয় সরকার নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ব্যবসায়িক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের মতো নানান সমস্যায় জর্জরিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায়, নগর উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ফলে সিটি কর্পোরেশন বা পৌর নগরায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ভূমিকা দৃশ্যমান হয়ে উঠে না। কার্যত সেকারণে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি মূল্যবান কৃষি জমি নষ্ট করছে। অপরিকল্পিত অবকাঠামোগত কারণে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা, বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে সুষ্ঠু পয়ঃ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। অপরিকল্পিত আবাসন ও সড়ক নির্মাণের কারণে প্রত্যেক নগরীজুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে অসহনীয় যানজট। যেখানে মূল্যবান কর্মঘন্টার ক্ষয় হচ্ছে। নগরগুলোতে পরিবহন ব্যবস্থায় পৃথক লেন ব্যবস্থা না থাকায় রোগী বা অত্যাবশ্যকীয় সেবা বিঘ্ন হচ্ছে। রিক্সা ও থ্রি হুইলারের ন্যায় স্বল্পগতির যানের আধিক্য ও তাতে জনগোষ্ঠির বিনিয়োগ এক ধরনের জাতীয় অপচয়। যা জাতীয় প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতাকে বাঁধাগ্রস্ত করছে।

এসব দিক বিবেচনায় এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষমাত্রার-৮ এ বলা আছে-জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা, উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন, আর্থিকসেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা, কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা, জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান, স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যসম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটনশিল্প প্রসারের কথা বলা হয়েছে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি এখন শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভোগ সীমিতকরণকেই বোঝায় না, বরং এটি নির্দেশ করে, সংখ্যালঘিষ্টের অ-টেকসই ভোগের কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্থ না হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের তাগিদই প্রদান করে না, বরং এটি এক নতুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ইঙ্গিত করে। এই প্রবৃদ্ধি বিশ্বের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন না করে এবং বিশ্বের ধারণযোগ্য ক্ষমতার সঙ্গে আপোস না করে বিশ্বের গুটিকয়েক সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠির পরিবর্তে সব মানুষের জন্য সুবিধা সৃষ্টির অঙ্গীকার করে। আমরা ব্যাপকভিত্তিক ও যথোপযুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অবারিত তথ্য প্রবাহের ব্যবহার করে সকলের জন্য উন্মুক্ত সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে সরকারের সকল স্তরে সরাসরি অংশীদারিত্বের নতুন কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ধারণাগত পর্যায় থেকে নগর নকশা ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাকরণে নগর ও অঞ্চল নীতিমালা ও পরিকল্পনা পদ্ধতিতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। যা নগর অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সহায়ক হতে পারে। টেকসই নগর উন্নয়নের প্রধান উপাদান হলো-পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নগরের জন্য অনন্য চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের সম্পৃক্ত। যেহেতু দ্রুত নগরায়নের ধারণা থেকে শহরগুলিতে অনেক সম্পদ ব্যবহার হয় এবং পরিবেশে এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে, তাই নগরায়নের পরিকল্পনায় সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিবেচনা রাখে। বিশেষ করে মূল্যবান ভূমিব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক উৎস রক্ষা, সাশ্রয়ী আবাসন, শহুরে দূষণ, বৈষম্য হ্রাস এবং আবাসন, সেবা, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য পৃথক জোন রেখে টেকসই নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; যা স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে।

স্বল্প আয়তনের ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ন জরুরি। বিক্ষিপ্তভাবে নগরায়নে বাহ্যিক উন্নতি হলে নগরগুলো নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত হবে। যানজট, জলাবদ্ধতার পাশাপাশি অগ্নি ও ভূমিকম্পের ন্যায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিদ্যমান নগর কাঠামোতে প্রায়ই অসম্ভব। এসব বাস্তবতা বিবেচনায় জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ১৯৯৩ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। যেখানে নগরে ব্যক্তিগত প্লটের পরিবর্তে ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতি চালু হয়েছে। মূল্যবান কৃষি জমি রক্ষায় সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আগামী প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তায় মূল্যবান ৮৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। এলোপাতাড়ি বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে প্রতিবছর ১ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ কৃষি জমির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে দারিদ্রপীড়িত নগরে পরিণত হবে।

তাই, আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই আবাস ভূমি রেখে যাওয়ার স্বার্থে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করে দেশের প্রতিটি গ্রামে পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলায় বিস্তৃত করা। সেই প্রেক্ষিতে প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের উপ-সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর বা উপ-সহকারী স্থপতির দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যদি এই মুহূর্তে সকল উপজেলায় হাউজিং অধিদপ্তরের শাখা অফিস খোলা না যায়, তাহলে উপজেলা পর্যায়ের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করে কার্যক্রম শুরু করা যায়।

২. গ্রামীণ জনপদের ঘরবাড়ি, রাস্তা, পুকুর, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবকিছু পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিটি থানা/ইউনিয়নে সার্ভে করে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা।

৩. 'কৃষি জমি রক্ষা কর-পরিকল্পিত গ্রাম গড়' এই রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে এলোপাতাড়ি ঘর বাড়ি নির্মাণে নিরুৎসাহিত করে ক্লাস্টার ভিলেজ নির্মাণে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা।

৪. প্রস্তাবিত ক্লাস্টার ভিলেজে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নকশা অনুযায়ী ব্যক্তি বা যৌথ মালিকানাধীন বহুতল বাড়ি নির্মাণের সুযোগ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. শিক্ষা, চিকিৎসা, সেবা ও আবাসন ক্ষেত্রগুলোর পৃথক জোন রেখে নগর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৭. বঙ্গবন্ধুর 'আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান' শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, কৃষি শিক্ষার আওতায় দক্ষ জনবল গঠনসহ সমগ্র জাতির মধ্যে দক্ষতা সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষকে বিভিন্ন পেশায় কর্মদক্ষতায় শিক্ষিত করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় প্রোডাক্টিভিটিই বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষিত সমাজই একসময় স্বউদ্যোগেই প্রতিটি গ্রামে গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত বহুমুখী কো-অপারেটিভ ব্যাবস্থাপনায়। যার মধ্য দিয়ে জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৮. গ্রামীণ পর্যায়ে সকল ইনফর্মাল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ফর্মাল অর্থনৈতিক কার্যক্রমভুক্ত করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীলকরণে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক এর কর্মপরিধি বিস্তৃতি করা।

৯. নতুন প্রজন্মের আগামী সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবেলায় কৃষি জমি রক্ষা ও পরিকল্পিত স্মার্ট গ্রাম গড়তে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের 'পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ের 'গৃহায়ন' অংশকে একত্রিকরণের মাধ্যমে স্মার্ট গ্রাম উন্নয়ন ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১০. সরকারের আশ্রায়ণ প্রকল্পকে দীর্ঘমেয়াদি সেবায় রূপান্তর ও অধিকতর সেবামূলক করার লক্ষ্যে বহুতল বিল্ডিং নির্মাণ এবং অবশিষ্ট খাস জমিতে কৃষি সমবায় ফার্ম গঠন করে দেয়া।

১১. শহরের কর্পোরেট ধনী শ্রেণী কর্তৃক কৃষি জমিতে নির্মিত সকল রিসোর্টসমূহ ভেঙ্গে ফেলা এবং আগামীতে কৃষি জমির অপব্যবহার রোধ করে রিসোর্ট নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপ পরিকল্পনা ধরে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার নগর অর্থনীতি উন্নয়নে বহুমাত্রিক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। এতে শহুরে জীবনমানে বৈচিত্র্যতা আসলেও নগরবাসীর জীবনযাত্রায় ব্যয় বহুলাংশে বেড়ে চলেছে। প্রাচুর্য ও জীবনব্যয়ের সামঞ্জস্যতা রেখে নগর অর্থনীতি ঢেলে সাজানো এখন সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। আয় বৈষম্য নগর জীবনব্যবস্থায় যে ধরনের সামাজিক অস্থিতিরতা সৃষ্টি হবে, সেটি অব্যাহত থাকলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অপরিহার্যভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। তাই স্থিতিশীল নগর অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নগর প্রাচুর্যের পাশাপাশি সর্বসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নীতি দর্শনের আলোকে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের শহরগুলির বৃদ্ধির ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ

শাহীন আহম্মেদ[১]

ভূমিকা

বিশ্বজুড়ে শহরগুলি সর্বদা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় এবং এটি নগরায়নকে উৎসাহিত করে যার ফলে মানুষ গ্রাম থেকে শহর এলাকায় চলে আসে এবং এই স্থানান্তরিত মানুষগুলিই শহরগুলিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকে। স্থানান্তরিত জনসংখ্যা তাদের যোগ্যতা নির্বিশেষে শহরগুলিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে তাদের বেশিরভাগ জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পায়। এক সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশের প্রায় ৩৫% থেকে ৮৮% কর্মশক্তি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিযুক্ত এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি দেশের জিডিপির প্রায় ৪৯% থেকে ৬৪% অবদান রাখে। ২০১০ সালে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপের ভিত্তিতে, বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান শ্রমবাজারের মোট চাকরির সংখ্যার প্রায় ৮৯% বলে অনুমান করা হয়। অনানুষ্ঠানিক খাত বলতে সেই কর্মীদের বোঝায় যারা স্ব-নিযুক্ত বা যারা স্ব-নিযুক্তদের জন্য কাজ করে। শহরগুলি বিশেষ করে এই অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক বা প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব যেমন কোভিড-১৯ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শহরগুলি স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নগর বৃদ্ধি রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে যা শহর অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রাণবন্ত করতে শহরগুলিতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অর্থায়ন করে যার মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবাগুলির আরামদায়ক চলাচল নিশ্চিত হয়, যানজট হ্রাস পায় যা শহরের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অপরিহার্য। বর্তমান লেখাটি শহরের বৃদ্ধির কারণ, ভারসাম্যহীন শহুরে বৃদ্ধির নেতিবাচক পরিণতি, বিভিন্ন শিক্ষাগত এবং দক্ষতা সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণির শহুরে মানুষের অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিকল্প/স্মার্ট কাজের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করবে। এটি বাংলাদেশের ছোট ও মাঝারি শহরগুলির বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তী কর্মপরিবেশ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে এই অর্থনৈতিক বিকল্পগুলির কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাগুলোও তুলে ধরবে।

শহরের বৃদ্ধির কারণসমূহ

শহরগুলো তাদের বৃহত্তর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। শহুরে জীবনযাত্রা দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং আধুনিক যেখানে বাসিন্দাদের জন্য উপলব্ধ বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা এবং সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শহর পানীয় জল, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদার যোগান দেয়। নগরায়নের সাথে যুক্ত উচ্চতর জীবনযাত্রার মান মানুষকে উন্নত খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই আয়-উৎপাদনের সুযোগগুলি দখলের জন্য লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ বিভাগীয়শহর বা বড় শহরগুলিতে চলে যাচ্ছে। শহরগুলো তাদের স্বপ্ন পূরণের স্থান। শহরগুলিতে প্রায়ই মানুষের জন্য পণ্য এবং উপকরণ উৎপাদনের জন্য তাদের কাছাকাছি কারখানা থাকে। শহরগুলিতে মেট্রো ট্রেন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি পরিবহনের ভাল মাধ্যম রয়েছে। এটি শহরের প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের খুব ভোরে শহরে আসতে এবং সন্ধ্যায় সহজেই স্ব-গৃহে ফিরে যাওয়ার সুবিধা দেয়। শহরগুলিতে উৎসব, মনোরঞ্জনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখার এবং উপভোগ করার জন্য প্রচুর সাংস্কৃতিক স্থান রয়েছে। শহুরে এলাকার কোলাহল এবং ব্যস্ততাও বিভিন্ন ধরণের লোকেরা উপভোগ করে। এগুলি ছাড়াও, শহরগুলি নতুন নতুন মানুষদের সাথে পরিচয় ও ভাব বিনিময়; বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ; গণ পরিবহন ব্যবহার; বড় বড় অনুষ্ঠান দেখা ও শেয়ার করা; অভিজ্ঞতা অর্জন; তুলনামূলক উচ্চতর বেতন এর চাকরি; খণ্ডকালীন বিভিন্ন কাজের সুযোগ; বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবা বিক্রির সুযোগ; শিল্প বা পরিষেবাগুলিতে চাকরি প্রদান; খেলাধুলার সুবিধা, কেনাকাটার এলাকা এবং রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিনোদন কেন্দ্রে সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা/পরিষেবাগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সব-সময়ই লোকের প্রয়োজন হয়। তাই শহরের রাস্তায়, বস্তি অথবা ব্যক্তিগত এবং সরকারি খাতের বাড়িতে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের উল্লিখিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সব সময়ই থাকে। আসলে, শহরের বাসিন্দারা ঘরের দোড়গোড়ায় প্রায় সকল পণ্য এবং পরিষেবা নিতে পছন্দ করে বা নিতে চায় যা বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে অনেক অনানুষ্ঠানিক পরিষেবার জন্ম দিচ্ছে এবং শহরের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

[১]সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি), সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়, তোপখানা, সিলেট-৩১০০

ভারসাম্যহীন শহুরে বৃদ্ধির নেতিবাচক পরিণতি

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়া ক্রমাগত শহুরে বৃদ্ধি শহরগুলোকে বৃহত্তর দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ স্থানীয় সরকারের আওতাধীন পৌর সংস্থা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর সীমিত পরিষেবার কভারেজ, সক্ষমতা অভাব ও অধিক রাজস্ব আয় না থাকায় বর্ধিত এলাকার সমস্ত লোকের জন্য সংস্থাগুলো পর্যাপ্ত পরিষেবা দিতে পারে না। বর্ধিত জনগোষ্ঠী পরিষেবা এবং অবকাঠামোতে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। যান্ত্রিক যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও কারখানাতে অতিরিক্ত জীবাশ্ম শক্তির ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাবসহ বৃহত্তর বায়ু দূষণের দিকে পরিচালিত করে। জীবনযাত্রার উচ্চ খরচ এবং চাকরির জন্য বর্ধিত প্রতিযোগিতাও মানুষকে দারিদ্রের দুষ্টচক্রে আটকাতে পারে। দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন শহরগুলোকে সহিংসতা, অপরাধ এবং সামাজিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। শহুরে বৃদ্ধির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, শহুরে দূষণ, পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধার অধিগত করার অসমতা। শহুরের বিস্তৃতি বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবনতির দিকে পরিচালিত করে যেমন বায়ু দূষণ বৃদ্ধি, জল দূষণ, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস বা বাসস্থানের ক্ষতি, ভূমির অতিরিক্ত ব্যবহার, এবং সবশেষে জীবনের মান হ্রাস। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ এবং শব্দ দূষণের কারণে নগর জীবন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে। শহরের রাস্তায় ও বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসকারি মানুষরা নিয়মিত উচ্ছেদের আশংকা, আগুন লাগা, মাস্তানদের নিপীড়ন ইত্যাদি অনিশ্চিয়তার মধ্যে কালাতিপাত করে। তারপরও, রাজধানী ঢাকা প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ এর অধিক অভ্যন্তরীণ অভিবাসী গ্রহণ করে, যাদের বেশিরভাগই শহরে পর্যাপ্ত আনুষ্ঠানিক আবাসন এবং কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে তাদেরকে বস্তিতে বসবাস এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য ছোট ও মাঝারি শহরেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

শহরগুলিতে বিদ্যমান অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগসমূহ

রাজধানীর পাশাপাশি বাংলাদেশের ছোট এবং মাঝারি আকারের শহরগুলিতে দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় লোকের জন্য অনেক অনানুষ্ঠানিক কাজের সুযোগ রয়েছে যেমন–

ক্যাটাগরি: ০১অস্তিত্ব রক্ষার কর্মসংস্থান

মৌলিক যোগ্যতা: অশিক্ষিত, চরম দরিদ্র (পুঁজি নেই), ন্যূনতম দক্ষতা নেই

কর্মক্ষেত্র: হকার, কুলি, ঠেলাচালক, ছিন্ন বস্ত্র বাছাইকারী, আবর্জনা সংগ্রহকারী, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারকারী; রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলে নৈমিত্তিক কর্মী; রাস্তার নাপিত, মুচি; ঘরের কাজ ইত্যাদি

ক্যাটাগরি: ০২ প্রাথমিক স্তরের কর্মসংস্থান

মৌলিক যোগ্যতা: স্বল্প শিক্ষা, অল্প পুঁজিসহ দরিদ্র, ন্যূনতম দক্ষতা

কাজের সুযোগ : রিকশাচালক; সবজি, ফল, মাংস, মাছ, মুদি ইত্যাদির রাস্তার বিক্রেতা; ফুটপাথ বিক্রেতা; নির্মাণ শ্রমিক, নির্মাণে নৈমিত্তিক বা দিনমজুর; স্থানীয় পরিবহন শ্রমিক; অস্থায়ী অফিস সহায়ক; ছোট দোকান বা বাজারে বিক্রয়কর্মী; বহনযোগ্য ফুডকার্ট বিক্রেতা ইত্যাদি।

ক্যাটাগরি : ০৩ মাধ্যমিক স্তরের কর্মসংস্থান

মৌলিক যোগ্যতা : মাঝারি শিক্ষিত, অল্প পুঁজি আছে, মাঝারি দক্ষতা আছে

কাজের সুযোগ : সাব-কন্ট্রাক্টেড দারোয়ান; নিরাপত্তারক্ষী; মোটরযানমেরামত, ব্যক্তিগত শিক্ষাদান, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি

ক্যাটাগরী : ০৪ তৃতীয় স্তরের কর্মসংস্থান

মৌলিক যোগ্যতা : শিক্ষিত, পরিমিত পুঁজি আছে, দক্ষতা আছে

কাজের সুযোগ : বিক্রয় প্রতিনিধি, শেয়ার বাজার ব্যবসা, ব্রোকার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি।

ছোট এবং মাঝারি শহরে স্মার্ট কাজের সুযোগ

স্মার্ট চাকরির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য বেশ কিছু অনুমান বা হাইপোথিসিসরয়েছে যেমন– বিদ্যমান চাকরির সুযোগের ক্যাটাগরিগুলি ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হবে বা সময়ের সাথে সাথে তাদের স্তর পরিবর্তন করবে; ক্রমাগত তারা দক্ষতা অর্জন করবে বা অভিজ্ঞ হবে। অনুকূল পরিস্থিতিতে, এটি আশা করা যায় যে লোকেরা অদক্ষ থেকে দক্ষ চাকরিতে; কম বেতন থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনের চাকরিতে স্থানান্তরিত হবে; আরও উপার্জনের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বা একাধিক চাকরিতে নিযুক্ত হবে; আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে নিম্ন থেকে উচ্চতর আরামদায়ক আবাসনে স্থানান্তর করবে। স্মার্ট চাকরির সুযোগ পাওয়ার জন্য পূর্বশর্তগুলি হলো : একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সৎ, স্ব-প্রণোদিত, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারী, উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ/ডেস্কটপ ব্যবহারকারী, বাজার বোঝার দক্ষতা, ধৈর্যশীল দক্ষতা উন্নতকারী এবং কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে।

বাংলাদেশের ছোট এবং মাঝারি শহরগুলিতে, ইন্টারনেট, ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম বিশেষ করে YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, Reddit, LinkedIn, Twitter ইত্যাদি ব্যবহার করে উপরোক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর শহরের বাসিন্দাদের জন্য বেশ কয়েকটি যুগোপযোগী স্মার্ট কর্ম সংস্থানের সুযোগ রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১. আপনার ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবহার করুন– উবার বা ওভাই, পাঠাও-এর জন্য ড্রাইভ করুন; লোকেদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান, পণ্য সরবরাহ করুন, আপনার গাড়ি ভাড়া করুন, বিজ্ঞাপন দিতে আপনার গাড়ি ব্যবহার করুন, আপনার পার্কিং স্থান ভাড়া দিন ইত্যাদি।

২. bdto-let.com ev Anztolet.com বা bpropertz.com-এর মাধ্যমে আপনার আবাসস্থলের একটি কক্ষ বা স্পেস ভাড়া দিন

৩. কারো জন্য ক্রেতার কাজ করুন

৪. একজন 'টাস্কার' হয়ে উঠুন [এটি হতে পারে বড় বড় পণ্য একত্রিত করা, বাসা বদলের আসবাবপত্র একত্রিত করা, পরিষ্কার করা, উঠানের কাজ বা এমনকি ছোট মেরামত করা। আপনি আপনার নিজস্ব ঘণ্টা প্রতি পারিশ্রমিকের হার এবং আপনাকে প্রাপ্যতার সময় সেট করুন। আপনি এটি সপ্তাহান্তে, সকালে বা সন্ধ্যায় করতে পারেন]

৫. আপনার অভিনয় প্রতিভা তুলে ধরুন অথবা একটি পটভূমি অভিনেতা হন

৬. আপনার নিজস্ব দক্ষতা বা স্থানীয় পণ্য বিক্রি করুন

৭. একটি ব্লগ শুরু করুন এবং ট্যুর গাইড হন

৮. একজন বাড়ির সাহায্যকারী হোন

৯. একটি পোষা প্রাণীর হাঁটার সহায়তাকারী হতে পারেন

১০. বেবি সিটার বা আয়া হতে পারেন

১১. একজন হাউস সিটার বা গৃহকর্মী হতে পারেন

১২. আপনার পরিষেবা বিক্রি করুন, কারো ব্যক্তিগত কেনাকাটা করুন

১৩. আপনার ইনটেরিয়র ডিজাইন দক্ষতা প্রস্তাব করুন

১৪. সঙ্গীত বা নাচের পাঠ দিন

১৫. ইবে বা অন্যান্য বিনামূল্যে বিক্রির ওয়েববসাইটগুলিতে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করুন

১৬. অনলাইন সার্ভেতে অংশ নিন

১৭. লোকদের জন্য খাবার রান্না করুন ফুডপান্ডা বা সহজ ফুড বা খাস ফুড বা কুকআপস অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করে

১৮. ক্লিনিকাল ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করুন

১৯. আপনার বন্ধুত্ব ভাড়া দিন (এমন অনেক লোক আছে যাদের শুধু গল্প ও সময় কাটানোর জন্য একজন বন্ধু দরকার। আপনি সেই বন্ধু হতে পারেন এবং একই সাথে একটি পরিপাটি অর্থ উপার্জন করতে পারেন)

২০. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক হোন

২১. শিল্প ছাত্রদের জন্য মডেল হোন

২২. নিজেকে অনানুষ্ঠানিক প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করুন যেমন : ডেলিভারিম্যান, বাড়ির সংস্কার, বাগানের মালি, ঘরোয়া পরিচ্ছন্নতা, বাগান করা, বেবিসিটিং, বাসায় যেয়ে মোটর, এয়ার-কন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি ক্লিনিং ও রিপেয়ার ইত্যাদি।

২৩. রাস্তা পরিষ্কার এবং আবর্জনা সংগ্রহকারীর মতো কমিউনিটি পরিষেবাগুলিতে নিযুক্ত হন।

২৪. ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ছোট উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করুন যেমন– WE, Pickaboo.com; চালডাল.কম; Bag-doom.com; PrizoShop.com; Othoba.com; ইভ্যালি; Ajkerdeal.com; Bikroy.com; Rokomari.com; ClickBD.com; Shwapno ইত্যাদি।

২৫. অনলাইন ফ্রিল্যান্স সার্ভিস মার্কেটপ্লেসে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করুন যেমন: Fiverr, Upwork, 99designs, Toptal, We Work Remotelz, Dribbble, Startupers, Authentic Jobs, Gigster, Creative Market ইত্যাদি। তাছাড়া ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করুন বিভিন্ন সেক্টরে যেমন : ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডাটা এন্ট্রি, ২ডি-৩ডি মডেলিং ইত্যাদি।

স্মার্ট কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারী পর্যায়ে গৃহিত উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশের মাধ্যমে স্মার্ট কর্মসংস্থান, মানব পুঁজির বৃদ্ধি, দক্ষ শ্রমশক্তি, যোগাযোগের বিরতীহীন অবকাঠামো এবং একটি নীতিগত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা যা বেসরকারি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করবে। একটি শহরের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীত করার জন্য, সরকারি এবং বেসরকারি

সংস্থাগুলিকে পূর্ববর্তী বিভাগগুলিতে আলোচিত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক স্মার্ট চাকরি প্রার্থীদের সহায়তা প্রদান করা উচিত। সরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে এবং এই খাতকে নগরবাসীর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উপার্জনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা নিশ্চিত যে শহরের বাসিন্দারা যদি এই স্মার্ট কাজের বিকল্পগুলির মাধ্যমে আরও বেশি উপার্জন করতে পারে তবে চাকরি দেওয়ার জন্য সরকারের উপর কম চাপ থাকবে। নগরবাসীর কাছ থেকে সরকার আরও রাজস্ব পাবে এবং ভারসাম্যহীন নগর বৃদ্ধির বেশিরভাগ নেতিবাচক পরিণতিগুলো সুশৃঙ্খল নগর সুশাসনের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও সহায়তা প্রদান করার জন্য। তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের জেলা পর্যায়ে (১২টি জেলা) আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপনের একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, স্মার্ট জব হোল্ডারদের বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সারদের কাজের জায়গা, শেখার জায়গা, মার্কেট প্লেস এবং এই সেক্টরে আগ্রহী অনেক তরুণদের কাছে তথ্য প্রচার ও প্রশিক্ষণের জায়গা হবে। তাছাড়া, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এবং বিশ্বব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল থেকে যৌথভাবে 'রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইনফর্মাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (RAISE)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। RAISE প্রকল্পটি বাংলাদেশে গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় কর্মসংস্থান সহজ করবে, অনানুষ্ঠানিক খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে এবং ১,৭৫০০০ নিম্ন আয়ের যুবক, ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা এবং কোভিড-১৯ আপদকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সারা দেশের শহুরে এবং পেরি-আরবান এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে পুনরায় তাদের কর্মসংস্থান করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। "যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন" ছিল বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি এবং মেগা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রমাণক। স্মার্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারি পর্যায়ে গৃহিত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (Demographic Dividend)-কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

উপসংহার

সমসাময়িক বিশ্বে বিভিন্ন স্মার্ট কাজের সুযোগ পেতে দক্ষতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। বর্ধিত শহরের বাসিন্দারা বর্তমানে কাজের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা করবে না বরং তারা নিজের জন্য কাজ তৈরি করবে, ঘরে বসে কাজ করবে এবং অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। জিও এবং এনজিওদের উচিত বাংলাদেশের ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে স্মার্ট অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানান্তরিত জনগণকে অনুপ্রাণিত করা ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রুপান্তরে সহযোগিতা করা। তবে, এটিও মনে রাখা উচিত যে ওয়েবভিত্তিক ফ্রিল্যান্সিং এবং ছোট উদ্যোক্তাদের স্মার্ট কাজের সুযোগগুলির সাথে কিছু ঝুঁকি জড়িত আছে যেমন একক মার্কেট প্লেস, ওয়েবসাইট বা একক সোশ্যাল মিডিয়ার উপর খুব বেশি নির্ভরশীলতা, অনলাইন পেমেন্ট হ্যাকিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এর বাণিজ্যিক ব্যবহারের ওপর উপর ফি আরোপ এবং ক্রমাগত ফী-বৃদ্ধি, ই-ব্যাংকিং এর অনলাইন নিরাপত্তার ঝুঁকি ইত্যাদি। সকলকে আর্থিক সেক্টরের ঝুঁকির বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং সে তদানুযায়ী কাজ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. https://www.preventionweb.net/publication/urban-resilience-bangladesh-integrating-local-and-national-planning-processes, ০৫-০৭-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
2. https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-urban-resilience-project-building-partnerships-saving-lives, ০৫-০৭-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
3. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2021.1899152?scroll=top& needAccess=true&role=tab ০৫-০৭-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
4. https://www.bpropertz.com/blog/factors-driving-citz-development05-07-2023 তারিখে সংগৃহীত
5. https://thefinancialexpress.com.bd/views/analzsis/gravitz-of-rural-urban-migration-and-its-impact-on-bangladesh-1579272481, 20-07-2023 তারিখে সংগৃহীত
6. https://planningtank.com/citz-insight/advantages-living-cities, ০৭-০৮-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
7. https://www.wisebread.com/15-lucrative-side-hustles-for-citz-dwellers, ১৫-০৮-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
8. https://bdnews24.com/opinion/comment/informal-sector-and-its-impact-on-dhaka, ১৫-০৮-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
9. https://thefinancialexpress.com.bd/views/analzsis/covid-19-economic-challenges-facing-bangladesh-1592064588, ২৫-০৮-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত
10. https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/bidenomics-challenges-to-deliver, ২৫-০৮-২০২৩ তারিখে সংগৃহীত

ফটোগ্যালারি
২

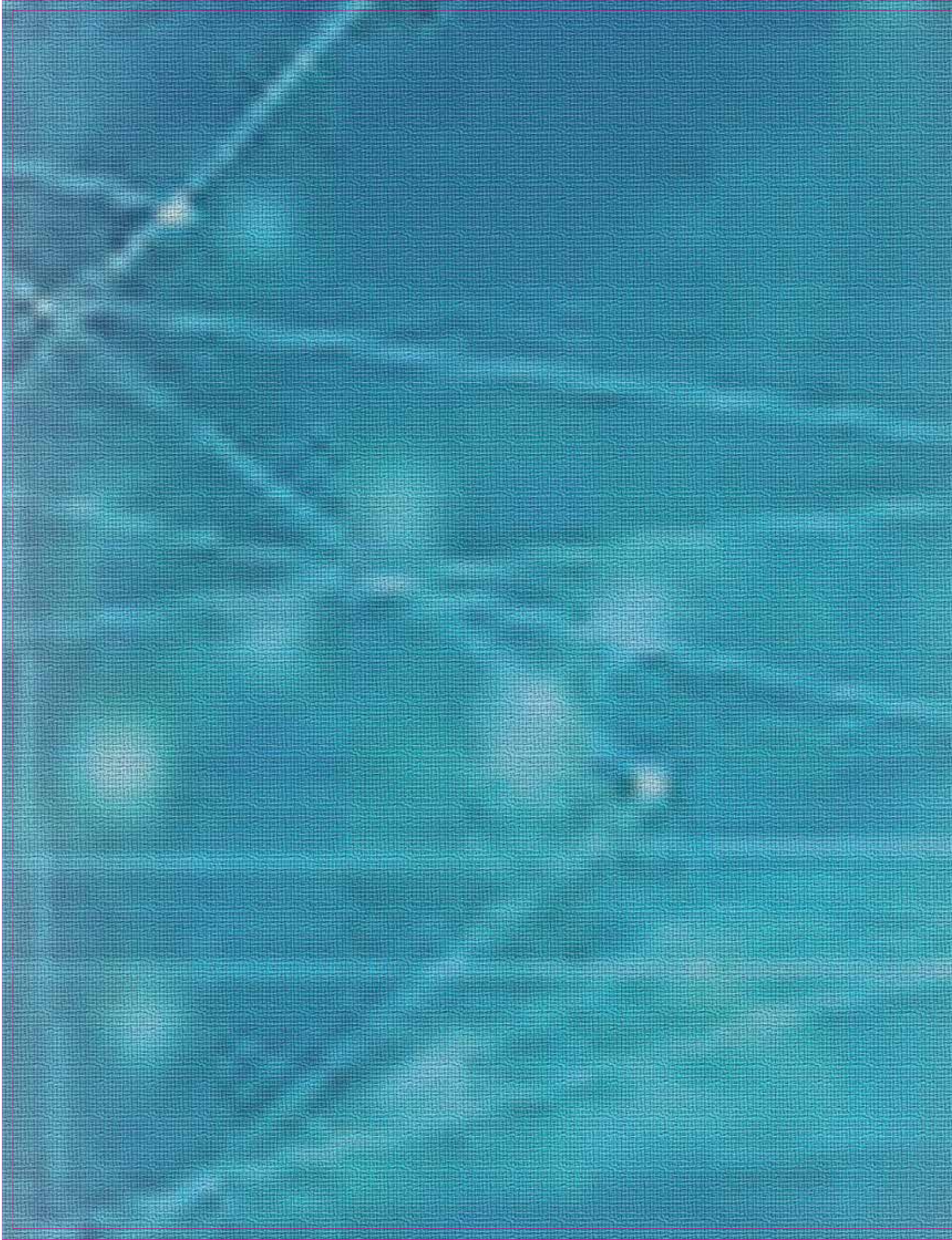

জাতীয় সংসদ ভবনের নর্থ প্লাজা কে কর্পোরেট অফিস আদলে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্পিকার মহোদয়ের উপস্থিতিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং অতিথিবৃন্দ

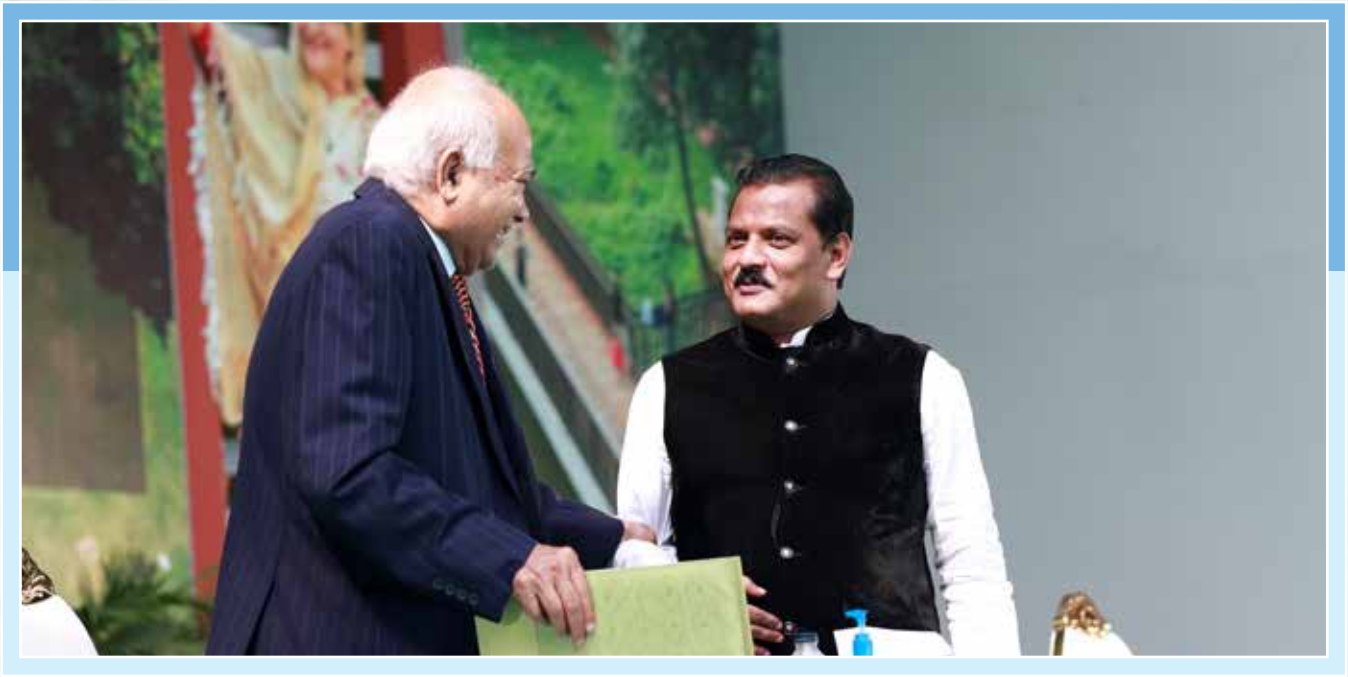

রমনা বটমূলে আয়োজিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

১৫ই আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ এ ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে (অনুষ্ঠানস্থলের) সাজসজ্জা ও অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব বসতি দিবস ২০২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রি জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি। মঞ্চে উপবিষ্ট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন এবং অন্যান্য দপ্তর, সংস্থার প্রধানগণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব বসতি দিবস ২০২২ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রি জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজধানীর আলোচনা সম্মেলন কেন্দ্রে ভূমিকম্প ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তুতি ও করণীয় শীর্ষক সেমিনারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজধানীর আলোচনা সম্মেলন কেন্দ্রে ভূমিকম্প ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তুতি ও করণীয় শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং আওতাঅধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে এইচবিআরআই আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা বিষয়ক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল শেষে অনুদানের চেক বিতরণ করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর পূর্ত ভবনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পূর্ত ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি এর সাথে সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ

স্থিতিশীল নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব

মো. সিরাজুল ইসলাম[১]

স্থান কালভেদে বিশ্বের যে কোনো দেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি বা প্রভাবের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, আবহাওয়া ও মানুষের জীবনমানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে বিধায় নগরবিন্যাসে স্থান কালভেদে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর নগরসভ্যতা বিকাশে আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের ন্যায় দ্রুত বর্ধনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি অঞ্চলের নগরায়নের সাথে অন্য অঞ্চলের নগরায়নের মৌলিক তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে এই পার্থক্য সাতক্ষীরা জেলার ৭.২ শতাংশ থেকে শুরু করে ঢাকা জেলার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশে সামগ্রিক নগরায়নে চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঢাকা জেলা সবচেয়ে বেশি নগরায়িত। এর বাইরে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার অবস্থান। জনসংখ্যার অসমবণ্টনই নগরায়নের এই পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। এর অনেক কারণ থাকলেও মোটাদাগে বলা যায়– নগর ও শহরের আকার, বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নয়নের গতি ও বিন্যাস এবং অবকাঠামো ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এই পার্থক্যের দেওয়াল গড়ে তুলেছে।

নগরায়ন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা থেকে স্পষ্ট যে, নগরায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া। যার ফলে মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষের শিল্প ও বাণিজ্যিভিত্তিক শহরের জীবন ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে। ১৯৫০ সালে অস্ট্রেলিয়ান আর্কিওলোজিস্ট গর্ডন চাইল্ড তার টাউন প্ল্যানিং রিভিউ গ্রন্থে নগরায়নের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে ১০টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো– (১) অনেক জনসংখ্যা ও ঘনবসতি থাকবে, (২) কারিগরি ও পেশাজীবী মানুষ থাকবে, (৩) খাজনা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, (৪) নির্মাণ ও স্থাপত্য থাকবে, (৫) শাসক শ্রেণী থাকবে, (৬) লিখন পদ্ধতি থাকবে, (৭) জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হবে, (৮) উৎপাদন নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, (১০) দক্ষ কারিগরি কর্মে নিয়োজিত থাকবে। তবে, আধুনিক নগরায়নের ধারণায় বলা হয়েছে– শহরে প্রত্যেকটি জিনিসের উন্নয়নকে নগরায়ন বলে। সমাজবিজ্ঞানী কাল মার্কসের মতে, গ্রামীণ সমাজ থেকে নগর সমাজে স্থানান্তরিত হওয়াই হচ্ছে নগরায়ন। এমিল ডুর্খেইন এর মতে, যান্ত্রিক সংহতি থেকে জৈবিক সংহতিতে পদার্পণই নগরায়ন। ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে, নগরায়ন হচ্ছে প্রথাগত সমাজ থেকে যৌক্তিক সমাজে উত্তরণ। এ্যালান বি. মাউন্ট জয় বলেন, নগরায়ন হচ্ছে আধুনিকায়নের সূচক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি চিহ্ন এবং সমগ্র বিশ্ব শুধু নগরায়নের দিকেই ধাবিত হয়েছে। যেখানে মানুষ শিল্প ও বাণিজ্যিভিত্তিক শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের আদমশুমারি কমিশন দেশের নগর কেন্দ্রগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে বিন্যাসিত করেছে। যেমন– মহানগরী (মেগাসিটি), পরিসংখ্যানগত মেট্রোপলিটন এলাকা (এসএমএ), পৌরসভা ও অন্যান্য নগরকেন্দ্র। এখানে ৫ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট মহানগরীকে মেগাসিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে হিসেবে ঢাকা মহানগরকে একমাত্র মেগাসিটি বলা যেতে পারে। যেখানে দেশের প্রায় ৩৮% জনগোষ্ঠি বাস করছে এবং বিভিন্ন শিল্প ও সরকারি বিয়োগের বিশাল ও অসমানুপাতিক অংশ এই অঞ্চল কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে সমন্বিত নগর প্রক্রিয়ায় ৫৬% জনগোষ্ঠি নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর অবস্থান মজবুত। অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নগরগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেশের ৪,১০৭টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার ৭৫ শতাংশই ঢাকা মহানগর অঞ্চলে। সমাজসেবাখাত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিকখাতেও একই অবস্থা দেখা যায়। বিগত দশকে দেশের ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫টির অবস্থান ঢাকা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা সেবা ও সুযোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি দৃশ্যমান।

তবে, এটি সত্য যে, নগরায়ন বিশ্বের সর্বত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি কার্যকর বাহন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নগরায়ন জাতীয় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বে নগরায়নের হার ৪০ শতাংশেরও কম এবং নগরখাত থেকে জিডিপির ৬০ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় দ্রুতবর্ধন নগরায়নে এ খাত জিডিপিতে ৬৫ শতাংশের বেশি অবদান রাখছে। যেখানে এই অবদান ১৯৭২-৭৩ সালের ২৫ শতাংশ থেকে ১৯৯৫–৯৬ সালে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়। উন্নয়নের বিশ্লেষণে বলা যায়– নগরায়ন সামষ্টিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে গড়ে ওঠা পোশাক শিল্প ও আনুষ্ঠানিক

[১]সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আইডিইবি

শিল্পখাতে লক্ষ লক্ষ অদক্ষ নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। মেগাসিটি ঢাকায় যে ধরনের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, সেখানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অঙ্গনে সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়নের কুফলও জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে অসহনীয় যানজট, নিম্নমানের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, গণপরিবহনের অপ্রতুলতা, পরিকল্পিত আবাসন ও সড়ক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, নগর বিস্তারে প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট ও জলাবদ্ধতা, সুষ্ঠু পয়ঃ ও বর্জ্যব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা নাগরিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। যা আর্থ-সামাজিক সংকট সৃষ্টির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সংকটের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ডিস ক্যাবল সংযোগ এবং অশিক্ষিত পরিবহন শ্রমিকদের অহেতুক হর্ণ বাজানোর মতো অভ্যাস স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার মতো নাগরিক সেবা ও উপযোগের উপরও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। এ সকল খাতের প্রতিটিতে সেবার স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততা এবং সাধারণভাবে অব্যবস্থাপনা সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে নগরায়নের সাথে নাগরিক সচেতনতার জাগরণ সৃষ্টি করতে না পারায় পরিবেশগত বিশেষ করে দেয়াল লিখন, যত্রতত্র পোস্টার ব্যানার সাটুনি, গাড়ি পার্কিং, মলমূত্র ত্যাগ শহরের পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাতে জনস্বাস্থ্যে যে ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে, সেটি স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত নানান সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। যা উত্তরণে রাষ্ট্রকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এটি নগর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাই, নগর শোভাবর্ধনের স্বার্থে সময় এসেছে যত্রতত্র পোস্টার ব্যানার টানানো, মূলমূত্র ত্যাগ, উচ্চ শব্দে গাড়ির হর্ণ বাজানো, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধসহ এই কুসংস্কৃতি থেকে জনগণকে বের করে আনা।

নগর অর্থনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি নিকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে– সব নগরে অপরিকল্পিত ও নিম্নমানের অবকাঠামো নির্মাণ। নাগরিকসেবায় নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মাঝে উন্নয়ন সমন্বয়হীনতা এর জন্য শতভাগ দায়ী ও অর্থ অপচয়ের আরেকটি নিৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশে স্থিতিশীল নগর উন্নয়ন ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি অন্যতম অন্তরায়। নগর পরিকল্পনায় সমন্বিত সঠিক ও দূরদর্শী পরিকল্পনা না থাকায় অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্য করা যায়– খোড়াখুড়ি, ভাঙ্গা গড়ার উন্নয়ন যজ্ঞ। দেখা যায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে, কিছুদিন পর ঐ সড়কটি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন লাইন স্থাপনের জন্য কাটা হচ্ছে। আবার সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা সেই ক্ষত দূর করার জন্য মেরামত করছে। তারপর গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও অন্যান্য পরিষেবা সংস্থাগুলো পর্যায়ক্রমে একই কাজ করে থাকে। অন্যদিকে রয়েছে– নিম্নমানের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারের অপসংস্কৃতি। যা অবকাঠামোগত উন্নয়নে স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে না। এটা জাতীয় অপচয়ের পাশাপাশি স্থিতিশীল নগায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাঁধা সৃষ্টি করছে। অথচ, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নগর উন্নয়ন যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে টেকসই নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে। টেকসই নগর উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অপচয়ের মানসিকতা থেকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টজনদের বের হয়ে আসতে হবে।

বর্তমান সরকার অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। নাগরিকদের ধ্যানে জ্ঞানে প্রয়োগে স্মার্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নগর অবকাঠামোগত পরিকল্পনার নকশা প্রণেতা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রকৌশলীবৃন্দের সততা ও দেশপ্রেমে এক্ষেত্রে স্মার্ট নাগরিকের পরিচয় দিতে হবে। এছাড়া, যারা নগর সুবিধা গ্রহণ করছেন, তাদেরকেও নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে স্মার্টভাবে। সড়ক ব্যবহারে ট্রাফিক আইন শতভাগ মেনে চলার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে হবে। অপ্রয়োজনে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের মানসিকতা পরিহার করে মেট্রোরেল ও পাবলিক পরিবহন ব্যবহারে অভ্যস্থ হতে হবে। এতে অসহনীয় নগর যানজট দূরীকরণে সহায়ক হবে।

চলমান শতাব্দিকে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম উভয় অঙ্গনে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের নগর অঞ্চলগুলি এখন উন্নত বিশ্বের বৈশ্বিক নগরীর প্রান্তিক বলয় হিসেবে কাজ করছে। কারণ নগরগুলোতে স্থাপিত শিল্প উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান। যা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখে। অন্যদিকে, এর বিরূপ প্রভাবও রয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল নগরাঞ্চলে ধনিক শ্রেণি শুধুমাত্র শিল্প স্থাপন করছে না। তারা আবাসন শিল্প, পর্যটন কেন্দ্রও নির্মাণ করছে। এসব করতে গিয়ে তারা শহরের নিম্নাঞ্চল, নদী খাল বিল ভরাট করছে। পাহাড় কেটে অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। মূল্যবান কৃষি জমি হ্রাসের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জলাধার কমে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম বন্যা ও জলাবদ্ধতা। হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির ফল ও মৎস্য। শিল্প বর্জ্য অপরিশোধিত নিষ্কাশনের ফলে দূষিত হচ্ছে পানি। বাড়ছে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। এর সবকিছুই স্থিতিশীল নগর বিকাশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায়। আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য সুষ্ঠু নগর বসতি গড়ে তুলতে সকল অনাসৃষ্টি পরিহার হোক বিশ্ব বসতি দিবসের অঙ্গীকার।

আমরা কিভাবে আগামীকে মূল্যায়ন করবো, সেটির উপর নির্ভর করে বর্তমান পরিকল্পনা। এখানে দূর দৃষ্টিতার ঘাটতি থাকলে শুধু বর্তমান

প্রজন্ম নয়, অনাগত প্রজন্মকেও তার মাশুল দিতে হবে। আমাদের পূর্বসূরিরা যে অপরিকল্পিত নগরায়ন করেছে, কিংবা অবকাঠামো গড়ে দিয়েছে, সেটির কুফলের মাশুল আমরা দিচ্ছি। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে রাজধানী ঢাকা মেগাসিটি হওয়া সত্বেও বসবাসের অযোগ্য নগরী হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত। এই অপরিকল্পিত নগরীকে বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য বর্তমান সরকার অনেক মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বহুমাত্রিক ফ্লাইওভার চালু হয়েছে। কিন্তু এরপরও নাগরিক জীবনে স্বস্তি আসছে না।

এই অস্বস্তির পেছনে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে যেমন ভুল নকশার দায় রয়েছে, তেমনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ না করার ব্যর্থতা রয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সাত রাস্তা-কাওরানবাজার-মগবাজার-বাংলামটর-মৌচাক-মালিবাগ-শান্তিনগর ফ্লাইওভার, বিজয় সরণী-তিব্বত ফ্লাইওভার, মহাখালী ফ্লাইওভারের নির্মাণ নকশার ত্রুটির কারণে সুফল নিশ্চিত করা যায়নি। এখনো মগবাজার মোড়, বেইলি রোড ক্রসিং, তিব্বত ক্রসিং, মহাখালী ক্রসিং, সোনারগাঁও মোড়ে অসহনীয় যানজটে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ক্ষয় হচ্ছে মূল্যবান শ্রমঘণ্টা, অপচয় হচ্ছে আমদানি নির্ভর জ্বালানি। সম্প্রতি বহুল প্রত্যাশিত বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে। সবার প্রত্যাশা ছিল এই মেগাপ্রকল্প অসহনীয় যানজট কমাবে। কিন্তু বাস্তবে ইন্টার সেকশগুলোতে ট্রাফিক জ্যাম বেড়েছে। বিশেষ করে ফার্মগেট ও বনানীতে। এই মেগাপ্রকল্পের নকশা প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত ছিল, তাদের অবশ্যই এ ধরনের পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে র‍্যাম্প এলাকার ট্রাফিক মোকাবিলায় সংলগ্ন এলাকার ইন্টারসেকশনগুলোতে ছোট ছোট ওভারপাস নির্মাণের ধারণা দেয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং থেকে দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত সোনারগাঁও জনপথ সড়কটি মেট্রোরেল মতিঝিল পর্যন্ত চালু হলে গাড়ির চাপ নিতে পারবে কিনা, বিমানবন্দর-গাজীপুর বিআরটি প্রকল্প বাস্তবায়নে হাউজ বিল্ডিং এলাকার ইন্টার সেকশনের বহুমাত্রিক গন্তব্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যা অদূর ভবিষ্যতে মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করার শংকা রয়েছে। এরূপ উদাহরণ অন্যান্য মহানগর ও নগর উন্নয়নে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ যেহেতু ব্যয়বহুল, তাই নতুন নগরায়নের ক্ষেত্রে ইন্টার সেকশনগুলোর যানজট নিরসনের বিষয়টি মাথায় রেখে ইউলুফ পদ্ধতি অনুসরণ করে নগর পরিকল্পনা গ্রহণে মনোযোগ দিতে হবে। নগর অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহার বেড়েছে। এই প্রযুক্তিকে সচল রাখার জন্য জ্বালানি যোগান দিতে গিয়ে বেড়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উপকরণ পুড়তে গিয়ে কার্বন নিঃসরণ মাত্রারিক্ত বেড়েছে। যার বিরূপ প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক জলবায়ুতে। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এর বিরূপ প্রভাবে আমরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। মাত্রারিক্ত গরম পড়া অতীতের সব রেকর্ডকে ভঙ্গ করছে। আগামীদিনে এই মাত্রা আরো বাড়ার শংকা রয়েছে। তাই, নগরায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় নবায়নযোগ্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে মনোযোগী হবার পাশাপাশি বৃক্ষায়ন ও প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। নচেৎ এ ধরনের পরিবেশ জনস্বাস্থ্যে যে ধরনের ঝুঁকি ফেলবে, তা মোকাবিলা করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে ফোন কোম্পানিগুলোর নেটওয়ার্ক বিস্তারে টাওয়ার রেডিশনের কারণে ক্যান্সারের ন্যায় মরণঘাতি বিস্তার হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে ফলজ ও মৎস্যসম্পদ। যা শুধু নগর অর্থনীতি নয়, ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি চাপ ফেলছে। নিম্ন আয়ের মানুষের পরিবারকে নিঃস্ব করছে। নগরায়নে আবহমান প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নদী-বিল-খাল-পুকুরগুলো সংরক্ষণ রেখে বনায়নকে উৎসাহিত করে পরিকল্পনা গ্রহণের কোন বিকল্প আমাদের নেই। আশা করি, সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করবেন সেটাই প্রত্যাশা।

Unveiling the Trajectory of Dhaka's Waste Generation and Carbon Credit Revenue Evolution towards sustainable economy

Dr. ANM Safiqul Alam Shaheen[1]

Dhaka, the capital city of Bangladesh, has been grappling with a burgeoning waste generation challenge in recent years. As its population continues to grow, so does the volume of waste produce daily. However, amidst this environmental concern, Dhaka has also been making progresstowards sustainability by exploring innovative waste management solutions and initiatives. Moreover, the city has been delving into the potential of carbon credit revenue generation, aiming to transform its waste management practices into a source of income while contributing to a more sustainable economy. The trajectory of waste generation and carbon credit revenue in Dhaka reflects its commitment to addressing environmental issues and fostering economic sustainability.

The substantial production of methane (CH4) from municipal solid waste (MSW) poses a significant environmental concern due to its 34 times higher global warming potential compared to carbon dioxide (CO^2). This means that the world needs to take action to make sure that MSW is managed in a sustainable way. The increasing lack of land around the world makes the waste-to-energy (WtE) strategy for managing municipal solid waste (MSW) in urban places look like a good idea. Not only does WtE help relieve land pressure, but it also creates electricity, heat, and green jobs. Changing the moisture content of MSW in a sensitivity study shows that MSW with low moisture content has a higher energy potential and less GHG emissions. Burning MSW could be a way for Bangladesh to use WtE to make energy from renewable sources.

This looks at how Dhaka's carbon market is changing and how it fits in with the European Union Emissions Trading System (EU ETS). It shows new methods and ways to grow. Bangladesh's carbon market is changing thanks to new technologies, strong institutional systems, and international cooperation. This helps reduce carbon emissions and fight climate change around the world.These different parts are the foundation of a greener, more robust, and sustainable future. They help Bangladesh grow in a way that doesn't hurt the environment and take the lead in making the world carbon-neutral.

Carbon Credit

A carbon credit is a generic term for any tradable certificate or permit representing the right to emit one ton of carbon dioxide or the mass of another greenhouse gas with a carbon dioxide equivalent (tCO^2e) equivalent to one ton of carbon dioxide. There are six greenhouse gasses and any of these gases if reduced/avoid/sink from the atmosphere, carbon credits can be earned.These gases are Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Perfluoro carbons, Hydrofluoro carbon and Sulphur hexafluoride. International treaty like CDM under the kyoto protocol along with VCS provides a robust platform to develop GHG emission reduction projects which will further earn carbon credits (Emission reductions).

[1]Managing Director, GEOMARK LIMITED Life member BAPA

Carbon Credits an Incentive for Better Waste Management

Waste management is one of the potential sectors under the Clean Development Mechanism. Solid waste management practices release high quantities of greenhouse gases in the atmosphere. This sector therefore creates significant opportunities for carbon mitigation, which could eventually become tradable carbon credits. Following procedures can be used to reduce/avoid GHG emissions from the waste materials.

1) Avoidance and utilization of methane from the landfill side: Methane (CH^4) constitutes approximately 50% of landfill gases, with the remaining 50% being CO^2 mixed with small quantities of other gases. Mitigation/abatement option is available to capture and utilize the methane for energy generation.

2) Energy generation through the process of pyrolysis using waste as a raw material: Pyrolysis is a thermo chemical decomposition of organic material at elevated temperatures in the absence of oxygen. It creates combustible gases for further use by using organic waste.

3) Energy efficiency/ saving through recycling of the waste material: It is always useful to recycle the waste material. As per the Energy Information Administration (EIA) website, a paper mill uses 40% less energy to make paper from recycled material than it does to make paper from fresh lumber.

Another example of plastic good manufacturing industry, Virgin plastic resin costs 40-50 % less than recycled resin. Plastic recycling process includes recovering scrap material or waste plastics and reprocessing the material into useful products.

Carbon Credit Benefits of Sewage to Energy

Projects based on generation of electric power from biogas, which is being produced as a result of digestion of sludge in STPs, are eligible for CDM (Clean Development Mechanism), as it will help in reducing and stabilizing the emissions due to methane which is a greenhouse gas.Based on the potential of biogas/power generation from STPs, expenditure on O&M can be offset by earning 'carbon credits' on recurring basis.

Benefits of CDM in SWM

- Reduction of greenhouse gas (GHG) into the atmosphere.
- Addition of electricity to the National grid.
- Collection of Methane/ avoiding the release of methane in the atmosphere for protecting the environment.
- Income generation and technology transfer.
- Poverty alleviation and sustainable development.

Bangladesh Scenario

It is an attempt to inform the policy maker of Bangladesh regarding the potentiality of MSW as renewable source of energy in the capital of Bangladesh, Dhaka.Bangladesh earned it's first ever revenue from carbon Credit sales way back in 2006.Most of the carbon credit revenue in our country came through improved cook stoves and another huge chunk of revenue was generated from solar home systems. A waste management based NGO in Dhaka established the world's first-ever composed plant and reduced 62,200 tonnes of carbon, earning 25.67 lakh taka.

There is a huge potentiality for Bangladesh in the carbon credit sale sector. Bangladesh can earn a huge amount of carbon credit revenue by carbon credit sales. But this sector needs to developed and established with smart technologies. According toEU JRC 2020, the par capita CO^2 Emissions for Bangladesh in 2020 was 0.64 and in 2017 it was 0.5. Still the amount of CO^2 Emissions for Bangladesh is much lesser than other developed

countries. So, Bangladesh has a huge scope for carbon credit sales and can potentially develop it as a reliable sector if the right measures are taken. Also, this revenue generated from carbon credit sales sector can be used for achieving sustainable development goals and for protecting the environment.

Increasing demand for energy and unsustainable MSW management along with ever-growing land scarcity have necessitated the need for formulating a national WtE strategy. Bangladesh is trying to diversify its energy base by deploying a broad energy mix. On the other hand, energy security issue is one of the four security issues addressed in "National Adaptation Action Plan to Climate Change (NAPA), 2009". In spite of growing concern regarding energy security, Bangladesh is still not stepping forward for the expansion of renewable energy technologies and yet relying on merely fossil fuel resources, with the small target to generate 5% and 10% of electricity using renewable energy technologies by 2015 and 2020, respectively.

Existing MSW Management in Dhaka

In Bangladesh, the ministry of local government and engineering department in each significant city or municipality are responsible for the management of municipal solid waste. Dhaka City Corporation (DCC) was in charge of the collection, transportation, and dispersal of municipal solid waste in Dhaka's 92 administrative wards. Currently, however, DCC is split into DCC (North) with 36 wards and DCC (South) with 56 wards. Collection, transportation, and disposal of municipal solid waste in the city of Dhaka are also divided accordingly. In Dhaka, all waste is sent to the Matuail and Amin Bazar dumps for open disposal. Matuail dump sites are designated as sanitary landfills, but unrestricted dumping is now commonplace. The waste from 55 wards in the metropolis of Dhaka is dumped in Matuail, while the waste from 36 wards is dumped in Amin Bazar.

Global Scenario in carbon emission and carbon credit market

According to **EU JRC 2020**

Country	2020 CO^2 Emissions (Mt)	2017 CO^2 Emissions (Mt)	2020 Emissions Per Capita	2017 Emissions Per Capita
China	11680.42	10877.22	8.2	7.7
United States	4535.3	5107.39	13.68	15.7
India	2411.73	2454.77	1.74	1.8
Russia	1674.23	1764.87	11.64	12.3
Japan	1061.77	1320.78	8.39	10.4
Germany	636.88	796.53	7.72	9.7
South Korea	621.47	673.32	12.07	13.2
Iran	690.24	671.45	8.26	8.3
Saudi Arabia	588.81	638.76	16.96	19.4
Canada	542.79	617.3	14.43	16.9

The idea of applying a cap-and-trade solution to carbon emissions was initiated with the Kyoto Protocol, a United Nations treaty to mitigate climate change that took effect in 2005. The Kyoto Protocol achieved mixed results and an extension to its terms has not yet been permitted.The essential tenet of the Kyoto Protocol was that Developed and industry based nations needed to lessen the amount of their CO^2 emissions.

Carbon credits in 2023 costs around $40-$80 per metric ton of CO^2 emissions or equivalent GHG emissions. Carbon demand can fluctuate depending on demands. During,2021 the carbon trading prices fell down to just $12.70 per metric ton.

In July 2021, China started a long-awaited national emissions-trading program. International Carbon Action Partnership. “China National ETS Commences Trading.” The program will initially involve 2,225 companies in the power sector and is designed to help the country reach its goal of achieving carbon neutrality by 2060. It will be the world's largest carbon market.That made the European Union Emissions Trading System the world's largest carbon trade market. The EU's trading market is still considered the benchmark for carbon trading.

With huge scope and potentiality, the carbon trading market is expanding day by day. Bangladesh’s Economy is growing and it’s enhancing the living standards of the citizens.Climate migrants from southern coastal belt of our country are gathering inthe metacity Dhaka for better living standards and they are producing huge amount waste that can be used astreasure for city and exchange it values in carbon credit revenue earning indicator for city’s growth.Bangladesh having bright prospects in this sector can turn out be a prominent trader if all the measures are taken and implied properly for the development of this sector.

References

Bhada-Tata, D. H. (2012). “What a waste: a global review of solid waste management,”. World Bank.

Lee, H. (2023, January 19). Shell Expects Rapid Growth in Carbon Credit Markets by 2030. Retrieved from bloomberg.com: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-19/shell-expects-rapid-growth-in-carbon-credit-markets-by-2030#xj4y7vzkg

R. Afroz, K. H.-K. (2009.). “Willingness to pay for waste management improvement in Dhaka city, Bangladesh,”. Journal of Environmental Management,, vol. 90, no. 1, pp. 492–503.

R. Afroz, R. T. (2011). “Selected socio-economic factors affecting the willingness to minimise solid waste in Dhaka city, Bangladesh,”. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 54, no. 6, pp. 711–731.

R. B. Chowdhury, M. S. (2013). "Current status of municipal solid waste management system in Chittagong, Bangladesh,” . International Journal of Environment and Waste Management, vol. 12, no. 2, pp. 167–188.

Rahman, S. (2023, April 8). Retrieved from The Business Standard: https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/bangladesh-earns-17m-carbon-credits-just-tip-iceberg-613410

কনস্ট্রাকশন ডিমোলিশন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

সাবরিন সুলতানা[১] মোঃ জাহিদ শাহ সুজা[২]

গত কয়েক দশক ধরে স্থপতি, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির অবদানে বাংলাদেশে নির্মাণ শিল্পের পরিসর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে সরকারি-বেসরকারি ও দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহায়তায় নির্মাণ পদ্ধতি এবং নির্মাণ সরঞ্জামের ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে, যা স্থাপনা সমূহকের আরও বেশি সৃজনশীল এবং আকর্ষণীয় করে তুলছে। এদিকে দ্রুত নগরায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নির্মাণ শিল্প ও দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, অলাভজনক স্থাপনা কিংবা নিয়ম বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ প্রভৃতি কারণে দিন দিন বিল্ডিং ডিমোলিশনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিমোলিশন অর্থ মানবসৃষ্ট বিল্ডিং বা কাঠামোকে ভেঙে ফেলা। যেকোনো স্থাপনা নির্মাণের মতো এর ভেঙে ফেলার কাজটিও অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক। যা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতে একটি ব্যাপক উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে।

বিল্ডিং এর কন্ট্রোলড ডিমোলিশন

প্রচলিত পদ্ধতিতে ডিমোলিশন

কাঠামোর বয়স, সামাজিক গুরুত্ব এবং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় একটি স্থাপনার সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ডিমোলিশন করা হয়ে থাকে। ডিমোলিশন মূলত একাধিক কারণে করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন:

১. কাঠামোটি ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করতে: বিল্ডিং ডিমোলিশনের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল যখন একটি স্থাপনা ক্রমাগত ব্যবহারের কারণে কাঠামোগতভাবে দুর্বল হয়ে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে ওঠে এবং ভবনের বাসিন্দাদের বা আশেপাশের স্থাপনাগুলোর জন্য বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করে। ভবনের নির্মাণ উপকরণের অবক্ষয়ের কারণে পুরনো ভবনগুলির ভিত্তি দুর্বল হওয়ার প্রবণতা থেকে সেটি ধসে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাৎক্ষণিক হুমকির কারণ না হলেও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তার স্বার্থে সেটি ভেঙে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে।

২. বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করলে: স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় বিল্ডিং কোডের বিধান বাড়ির মালিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকরা অনুসরণ না করে নির্মাণ নীতি লঙ্ঘন করলে, রাষ্ট্রীয় জমি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করলে কিংবা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কাঠামো তার প্রত্যাশিত মান পূরণ করতে না পারলে সম্পত্তির মালিকদের তাদের কাঠামো ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়। যেমন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ৪০ তলা ভবন সুপারটেক টুইন টাওয়ার, গত বছর বিল্ডিং কোডের গুরুতর লঙ্ঘনের কারণে প্রায় ৩৭০০ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করে মাত্র ৯ সেকেন্ডে ভেঙে ফেলা হয় [১]।

৩. কাঠামোর পরিসর বৃদ্ধি করতে : জনগণের চাহিদা মেটাতে অথবা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পুরাতন ভবনগুলোতে অতিরিক্ত স্থানের প্রয়োজন হতে পারে । এক্ষেত্রে কাঠামোটি সম্পূর্ণ বা আংশিক ডিমোলিশনের প্রয়োজন হয়। যেমন, নিউইয়র্কে ৭০৭ ফুট লম্বা ও ৫২ তলা বিশিষ্ট ২৭০ পার্ক অ্যাভিনিউ ভবনটি আরও বেশি উন্নত এবং অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৭০ তলা ভবন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২০২১ সালে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

[১]রিসার্চ ফেলো, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা। [২]রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

শহরে অবস্থিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোকে রক্ষা করতে বিস্ফোরক ব্যবহার না করে ভবনটিকে স্ক্যাফোল্ডিং এবং নেট দিয়ে আবৃত করে ক্রেন, রোবট ও দক্ষ জনশক্তির সাহায্যে এক বছরের মধ্যে ভেঙে ফেলা হয়। দালানটিতে ব্যবহৃত ৯০% উপাদান পুনঃব্যবহার ও রিসাইকেল করা হয়, যা এটিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব ডিমোলিশনে পরিণত করে [২]।

৪. ভবনের পর্যাপ্ত বৈধতা না থাকলে : ভবনের অবস্থান ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে যদি তা ক্রেতা আকর্ষণ করতে না পারে, ঋণ পরিশোধ করতে না পারে কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘন করে, তাহলে একটি স্থাপনা তার দাঁড়িয়ে থাকার বৈধতা হারায়। সেক্ষেত্রে এটি ভেঙে ফেলার কথা বিবেচনা করা হয়।

৫. প্রাকৃতিকভাবে বিপর্যস্ত বিল্ডিং অপসারণ করতে : ঘুর্ণিঝড়, সুনামি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ ডিমোলিশনের প্রয়োজন হয়।একটি সম্পূর্ণ স্থাপনা ভেঙে ফেলার ধারণাটি একসময় বাংলাদেশের জন্য নতুন হলেও, গত এক দশকে দেশের বিপুল জনসংখ্যার বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের তাগিদে কিংবা নীতি লঙ্ঘন করে বিল্ডিং গড়ার কারণে ছোট বড় স্থাপনা থেকে শুরু করে বহুল আলোচিত র‍্যাংগস্ ভবন ও বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলা হয়। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত দুটি ভবন ভাঙতে গিয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা এ বিষয়ে আমাদের গুরুত্বারোপ করার সংকেত দেয়।

পুরাতন বিমান বন্দর এবং রাজধানীর যানজট নিয়ন্ত্রণে বিজয় স্বরণীর সাথে তেজগাঁওকে যুক্ত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ১০ তলা বিশিষ্ট র‍্যাংগস্ ভবন ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ধরণের সুবিশাল স্থাপনার ডিমোলিশন ছিলো বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা, সঠিক পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত সতর্কতার অভাবে তেজগাঁও বিজয় সরণিতে র‍্যাংগস্ ভবন ভাঙতে গিয়ে ১১ জন শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা দ্যাখে বাংলাদেশ। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

র‍্যাংগস্ ভবন

বিজিএমই ভবন

ডিমোলিশন সাধারণত এমন জায়গাগুলোর কাছাকাছি করা হয় যেখানে জনগণের অবাধ চলাচল থাকে। তাই যেকোনো দুর্ঘটনা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ডিমোলিশনের কাজগুলো নিরাপত্তা বিষয়ক কোনো জরিপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই শুরু করা হয়। ফলস্বরুপ ২০০৬ সালে ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ফিনিক্স ভবনে অপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কাজ চলাকালে পুরো ভবনটি ধ্বসে পড়ে শ্রমিক ও পথচারীসহ ১৭ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয় [৩]।

অন্যদিকে ১৬তলা বিজিএমইএ ভবন জলাধার আইন লঙ্ঘন করায় হাতিরঝিলের ক্যান্সার আখ্যায়িত করে ২০১১ সালে ভবনটিকে ভেঙে ফেলার রায় আসে হাই কোর্ট থেকে। তখন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তা ও চীনা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সর্বাধুনিক নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ (Controlled demolition) অথবা ডিনামাইট পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত বিশ্বের আদলে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভবনটি অপসারণের কাজ করা হবে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রকম বিবেচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে ভবনটি অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার কারণ হিসেবে পদ্ধতিটিকে অধিক ব্যয়বহুল ভবনের ইট, রড, ফিটিংসসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পুনঃব্যবহারে সংশয় ও পাশে অবস্থিত অন্যান্য স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। যদিও ডিনামাইট পদ্ধতি ব্যবহার দেশে ডিমোলিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য নতুন দৃষ্টান্ত হতে পারতো।

পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশে ডিমোলিশন প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ডিমোলিশনের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলোতে সাধারণত পরিবেশ এবং জনসাধারণের প্রতি খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশে বিগত দিনগুলোতে বড় স্থাপনা গুলোর ডিমোলিশন পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঠিকাদাররা সাধারণত ইট পাথরের দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলাতেই মনোনিবেশ করেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড- ২০২০ (BNBC) এর সপ্তম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে ডিমোলিশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাসহ সনাতন পদ্ধতিতে স্থাপনা ভাঙার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ধাপ, দেয়াল, ছাদ, সিড়ি এমনকি বিম, কলাম ভাঙার জন্য প্রয়োজনীর সতর্কতা, সেই সাথে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে ব্লাস্ট অপারেশন অর্থাৎ বিস্ফোরক ব্যবহার করে ডিমোলিশন এবং এ থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ বিষয়ক বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে [৪]। ডিমোলিশনের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার জন্য সম্পূর্ণ কোড থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে এর প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায়শই এর ফলস্বরূপ ধ্বংসাবশেষ রিসাইকেল বা পুনঃব্যবহার না করে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ডিমোলিশনের কৌশল, ঝুঁকি মূল্যায়ন, শ্রমিক- জনসাধারণ ও পার্শ্ববর্তি স্থাপনার নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা, ভূমি খনন প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

ডিমোলিশনের মাধ্যমে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য সাধারণত ভবন, রাস্তা, সেতু এবং অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ, সংস্কার এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে উৎপন্ন হয়। এসকল বর্জ্যে বিভিন্ন বিপজ্জনক পদার্থ যেমন অ্যাসফেল্ট, লৌহঘটিত ধাতু, প্লাস্টিক, কাঁচ, কাগজ, পিচবোর্ড, কংক্রিট, কাঠ ইত্যাদি মিশ্র অবস্থায় থাকতে পারে। যাকে বলা হয় Municipal solid waste। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ২.০১ বিলিয়ন মেট্রিক টন Municipal solid waste উৎপন্ন হয়। নগরায়ন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পায়নের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে এটি আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ প্রতিবছর ৩.৪০ বিলিয়ন মেট্রিক টন Municipal solid waste উৎপন্ন হবে বলে ধারণা করছেন গবেষকরা [৫]। বিশ্বব্যাপী নির্মাণ খাত কঠিন বর্জ্যের এক-তৃতীয়াংশ অবদান রাখে যা মোট কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ [৬]। কঠিন এই বর্জ্য গুলো বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণ যা নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও ধ্বংস কার্যক্রম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সৃষ্ট। ডিমোলিশন বর্জ্যের মধ্যে অবকাঠামো তৈরিতে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির অংশবিশেষ ছাড়াও বিভিন্ন জৈব-অজৈব বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক উপাদান উপস্থিত থাকে, যা শুধু মানবদেহ নয় বরং পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর।

এদিকে নির্মাণ খাতে শ্রমিক নিরাপত্তায় উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান এখনও অনেকটা পিছিয়ে। ডিমোলিশন কর্মীদের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভারী যন্ত্রপাতি চালাতে হয়, যা নিরাপদে ও সফলভাবে ব্যবহার করতে বিশেষ পদ্ধতির এবং দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে ডিমোলিশনের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা গ্রহণ না করায় গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখিন হয়। যেমন উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, দুর্বল কাঠামো ভেঙে যাওয়া, উচ্চ শব্দ, বিপজ্জনক ধ্বংসাবশেষ এবং যন্ত্রপাতির ভুল প্রয়োগ ইত্যাদি। অপরিকল্পিত পদক্ষেপ শ্রমিকদের শারীরিক আঘাতের পাশাপাশি, শ্বাসকষ্ট, তড়িতাহত, অগ্নিদগ্ধ এবং কখনও মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন মাত্রায় এই ধরণের দুর্ঘটনা রাজধানী ছাড়াও দেশের অন্যান্য প্রান্তে ঘটে যাচ্ছে যা নিয়মিত সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। বীমা পলিসির অনুপস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কেউ কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণও পান না। তাই ডিমোলিশনের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে মানবসৃষ্ট ভুল কমিয়ে আনার সাহায্যে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে হবে।

ডিমোলিশন কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা Personal Protective Equipment (PPE) যেমন হেলমেট, বুট, গ্লাভস্, চশমা, টেকসই পোশাক প্রভৃতি পরিধান করতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোতে সেন্সরের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থান থেকে শুরু করে গতিবিধি এমনকি হৃদস্পন্দন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শ্রমিকদের মধ্যে PPE পরিধানের ক্ষেত্রে এক প্রকার অনিহা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং কর্মীদের সচেতন করার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে ডিমোলিশন সাইট যথাসম্ভব পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অমসৃণ-পিচ্ছিল স্থান, যত্রতত্র যন্ত্রপাতি ফেলে রাখা কিংবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারে অসতর্ক থাকা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ডিমোলিশন কাজটি যেমন বিপজ্জনক, তেমনি বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান তৈরি করার একটি নতুন সম্ভাবনাও বটে। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি এবং কার্যকর সংগঠনের যারা নিরাপদ ডিমোলিশনে আদর্শ পদ্ধতি গ্রহণ, নিরাপত্তা বিধান অনুসরণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সময়ের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে ডিমোলিশন এবং এ থেকে প্রাপ্ত সরঞ্জামের পুনঃব্যবহার ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করবে।

অনুমোদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত যোগ্য ঠিকাদারদের দ্বারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রকৌশলীর পরামর্শে ডিমোলিশন করা উচিত। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের জন্য যেখানে ইদানিং বৃহৎ পরিসরে ডিমোলিশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আশা উচিত।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোর একটি সর্বোত্তম উপায় হল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। পূর্বঘটিত দুর্ঘটনা সমূহের কারণ বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ বিবেচনায় এনে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এক্সকাভেটর, লোডার, ট্রাক, ক্রেন, বুল্ডোজার, ড্রিল মেশিন, ভাইব্রেটর, স্ক্যাফোল্ডিং প্রভৃতি ভারি যন্ত্র ব্যবহারে শ্রমিকদের দক্ষ করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি প্রকৌশলী এবং প্রবাসে অবস্থানরত অভিজ্ঞ বাংলাদেশি শ্রমিকের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রমিক নিরাপত্তার পাশাপাশি জনগণের নিরাপত্তা নিয়েও সচেতন হতে হবে। যেকোন কাঠামো ভেঙে ফেলার পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ কাঠামোটির আশেপাশের পরিবেশ ও সেখানে অবস্থানরত সাধারণ জনগণের ওপর এর প্রভাব বিবেচনায় আনতে হবে। ডিমোলিশন শুরু করার আগে জনগণকে সতর্ক করার পাশাপাশি অন্যান্য জীবন ও সম্পত্তিকে সুরক্ষা দিতে ফুটপাতের শেড এবং ছাউনি ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ক্যাচ প্লাটফর্ম, পার্শ্বীয় ব্রেসিং, রেলিং, প্যাসেজওয়ে, মই, সিফট সিড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন, অবকাঠামো নির্মাণ ও ডিমোলিশন থেকে উৎপন্ন বিপুল বর্জ্যের কারণে নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশগত অবক্ষয় এবং দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়। কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও কৌশল গ্রহণে ব্যর্থতা বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় প্রজন্মের উপর পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই অনাকাঙ্খিত পরিবেশ দূষণ রোধ করতে ডিমোলিশন থেকে প্রাপ্ত উপাদানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অ্যাসফাল্ট, ইট, কংক্রিট, লৌহঘটিত ধাতু, কাচ, কাগজ, পিচবোর্ড, প্লাস্টিক এবং কাঠ প্রভৃতি বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করে তোলার কার্যকর প্রযুক্তির বিকাশ এবং সেগুলো ব্যবহার করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে নগরায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডিমোলিশনের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি করছে। শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পুরাতন অবকাঠামো ডিমোলিশনের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সেই সাথে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিমোলিশন এক্সপার্ট শ্রমিক তৈরি, শ্রমিক নিরাপত্তা ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। সর্বোপরি, নির্মাণ শিল্পে যথার্থ আইনের প্রয়োগ ও ডিমোলিশন কৌশল বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের উৎপাদনশীলতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নির্মাণ শিল্পের ভূমিকা বাড়াতে এবং টেকসই নগরী গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

তথ্যসূত্র:

1. In India's largest demolition till date, Supertech twin towers brought down within nine seconds in Noida, in The Times of India. Aug 28, 2022.
2. 270 Park Avenue's Demolition Is Complete While New Steel Superstructure Rises In Midtown East, in New York YIMBY. June 7, 2021.
3. 16 die as 6-storey building collapses in Tejgaon, in The Daily Star. 2006.
4. BNBC 2020
5. Ratnasabapathy, S., S. Perera, and A. Alashwal, A review of smart technology usage in construction and demolition waste management. 2019.
6. Ajayi, S.O., et al., Critical management practices influencing on-site waste minimization in construction projects. Waste management, 2017. 59: p. 330-339.

Dhaka's Informal Economy: An In-depth Study

S M Sium[1]

1. Introduction:

Dhaka, the capital of Bangladesh, is undergoing rapid urbanization and growth.Among the multifaceted economic characteristics, the informal sector stands out both in its size and in its importance.Recent reports show that 87% of the city's workforce is related to this segment6.Although often operating outside the formal legal framework, Dhaka's informal economy is about more than just evadingregulations; it is a survival strategy for many people, providing a framework for resilience, innovation and adaptability.

2. Rickshaw Pullers: The Heartbeat of Dhaka's Informal Economy

In the sprawling capital city, Dhaka, rickshaws are as iconic as skyscrapers, representing not just a mode of transport but also a testament to resilience, culture and history of the city.

2.1 Historical background:

Rickshaws first appeared in Dhaka in the 1940s and since then, they have become ingrained in the urban fabric2.Initially introduced as a modern mode of transportation, they quickly became a source of income for thousands of people and an affordable means of transportation for the masses.

2.2 Importance in Dhaka's economy:

1. Employment:Dhaka is known as the "rickshaw capital of the world", with approximately 400,000 rickshaws providing employment to a significant number of the city's residents9.
2. Environmentally friendly transportation:In a city struggling with pollution, rickshaws are an environmentally friendly alternative means of transport.They do not produce emissions, thus helping to fight air pollution.
3. Accessibility:Their size allows rickshaws to navigate narrow alleys and congested areas, reaching parts of the city that larger vehicles cannot reach.
4. Arts and culture:The rickshaws of Dhaka are moving canvases, often decorated with vivid paintings depicting the culture, folklore and historical events of Bangladesh.This type of "rickshaw art" has been recognized and highly appreciated both domestically and internationally9.

3. Street vendors and Hawkers: The Pulse of Dhaka's informal economy

The sidewalks and alleys of Dhaka come alive with the bustling activity of street vendors and hawkers.Selling everything from fresh produce to crafts, these individuals are an integral part of the city's economic and cultural landscape.Let us take a closer look at the role of street vendors and hawkers in Dhaka's informal economy.

3.1 Historical roots:

Street vending has deep historical roots in Dhaka.Historically, these hawkers and street vendors served urban populations, providing products at affordable prices, thereby bridging the gap between rural producers and urban consumers1.Over time, their numbers increased in response to the city's growing population and economic activity.

[1]M S Student, Department of Geography And Environment, University of Dhaka

3.2 Economic and social importance:

1. Livelihood:A conservative estimate suggests there are about 300,000 street vendors in Dhaka5, making them an important part of the city's workforce.For many people, street vending is an easy path to self-employment and economic independence.
2. Affordable goods and services:Street vendors make a variety of products and services accessible and affordable to the public, often selling items in smaller, more manageable quantities to satisfy budgetsof the urban poor.
3. Flexibility:The informal nature of their business allows them to be highly adaptable and respond quickly to changes in consumer needs and trends.
4. Cultural significance:From selling traditional Bangladeshi snacks to the latest fashion accessories, street vendors add vibrancy to the streets of Dhaka and contribute to its unique cultural identity.

4. Day Laborers: The Unseen Pillars of Dhaka`s Informal Economy

Amid Dhaka's rapidly changing skyline, the often overlooked daily wage workers form the backbone of the city's dynamic growth.Found on construction sites, at transportation hubs and in bustling markets, these workers are essential elements of Dhaka's economy.Let's highlight the important role of day workers in the city's informal sector.

4.1 Number of day laborers:Conservative estimates suggest that day laborers make up about 5% of the city's total workforce7.However, due to the transient nature of the work, the actual number is likely to be significantly higher.

4.2 Different Work Roles:

The term “day worker” in Dhaka covers many different work roles:construction workers, porters at bus stations and markets, warehouse loaders and many others.Their work, often physical and manual, is often performed on a daily basis without long-term contracts.

4.3 Economic importance:

1. Flexibility for employers:Employers often rely on day laborers for their flexibility, hiring them for short-term tasks without the long-term commitment of long-term employment, giving businesses the ability to adapt .
2. Motivation to promote infrastructure development:Day laborers play a central role in the development of Dhaka's infrastructure, from high-rise buildings to road construction, directly contributing to the city's growth.
3. Consumers in the local economy:Despite their meager income, day laborers still contribute as consumers to the local economy, spending on food, housing and basic needs.

5. Domestic Workers: The Silent Contributors to Dhaka's Informal Economy

In the metropolis of Dhaka, behind the closed doors of apartments and houses, domestic workers are often an invisible but indispensable part of the informal economy.Usually young and female, these workers provide services essential to the functioning of households.Let us consider the role of domestic workers in the informal sector of Dhaka.

5.1 Who is a domestic workers?

The term primarily refers to individuals - mainly women and often minors - working in the employer's household.Their duties include cooking, cleaning, child care, elder care, and other household chores.

5.2 Scale and scope:

According to some estimates, there are several hundred thousand domestic workers in Dhaka4, although the transient nature of the work and lack of official registration make it difficult to come up with exact numbers.

5.3 Economic and Social Implications:

1. Gender dynamics:Domestic work in Dhaka relies heavily on female workers.It provides employment opportunities for women, especially those without formal education or professional training.
2. Urban migration:Many domestic workers come from poor rural areas, seeking better economic opportunities in Dhaka10.
3. Social support:Especially in middle-class and rich families, housekeepers play an important role, creating conditions for family members to pursue careers outside the family.

6. Waste Pickers: The Uncelebrated Custodians of Dhaka's Informal Economy

In the ever-growing urban expanse of Dhaka, amidst the skyscrapers and crowded streets, waste pickers travels the city, quietly contributing to waste management and recycling. This largely unnoticed community plays a central role in Dhaka's economic and environmental framework.Let's explore the importance, challenges and potential of waste pickers in Dhaka's informal economy.

6.1 Who are the waste pickers?

These are individuals who collect, sort, and sell recyclable materials from trash, landfills, and streets.These are often marginalized populations, including adults and children.

6.2 Presence and scale :

It is estimated that there are thousands of waste pickers operating in Dhaka3, collecting recyclable materials for a living.Due to the informal nature of their work, accurate figures are difficult to come by.

6.3 Economic and environmental importance :

1. Recycle and reduce waste:Waste pickers recover large amounts of recyclable materials that would otherwise go to landfills, thereby reducing environmental degradation.
2. Contribute to the recycling value chain:The materials recovered by waste pickers are gone to the recycling industry and used as raw materials for various products.
3. Economic lifeline:For many marginalized people, waste collection provides a viable livelihood, even if their income is limited.
4. Reduce urban waste management costs:By diverting a significant portion of waste from landfills, waste pickers have inadvertently reduced the costs of urban waste management.

7. Informal Retail and Services: The Vibrant Pulse of Dhaka`s Informal Economy

Within the streets and alleyways of Dhaka, informal retail and services manifest as a small enterprise– from street vendors peddling fresh product, to makeshift salons offering haircuts, and kiosks fixing electronics. These businesses, often rooted in tradition and necessity, form an important part of the economic and social fabric of Dhaka.

7.1 Who are involved?

Informal retail and services include many types of entrepreneurs:street vendors selling food, clothing or household items; Electronic, shoe, and bicycle repair services; small hairdressing and beauty salons; and even local artists or traditional healers.

7.2 Scale and importance:

Informal retailers and service providers are scattered across Dhaka.By some estimates, they collectively serve millions of Dhakaites daily8, making them a central part of everyday urban life.

7.3 Economic and social relevance:

1. Accessibility and affordability : Informal retailers and service providers provide goods and services at more accessible prices, serving a wide range of people, especially the urban poor.

2. Job opportunities : This area provides livelihood to a large number of people, especially those without formal qualifications.
3. Cultural significance : Many informal services, such as vendors selling local crafts or traditional medicine, are culturally and historically important, preserving traditions in urban environments.
4. Respond quickly to consumer needs : Informal retailers can quickly adapt to changing consumer demands, given their smaller scale and direct interaction with customers.

8. Challenges :

1. Vulnerability: By its nature, the informal economy does not benefit from the structural protections and benefits of the formal sector.Workers often face exploitation, fluctuating income and job insecurity.
2. Lack of recognition: Despite its major contribution to Dhaka's GDP, the informal sector remains largely invisible in official policy discourse and urban planning.
3. Health and safety concerns: Informal workers, whether they are waste pickers exposed to hazardous materials or street vendors operating in crowded areas, face many health risks.
4. Legal and space threats: The absence of designated spaces or recognition often leads to evictions, confiscations, and legal actions against these workers.

9. Potential and opportunities :

1. Adaptability : The strength of the informal sector lies in its flexibility.Its capacity to respond quickly to market changes can be harnessed for more substantial, structured growth.
2. Workforce participation : Women and young people, who have difficulty entering the formal sector, often find opportunities in the informal sector.
3. Entrepreneurial spirit : From innovative street-food recipes to unique crafts, Dhaka's informal economy demonstrates real entrepreneurial prowess.
4. Formalization path : Through strategic policies, converting parts of the informal economy to the formal sector can ensure better labor rights and increase state revenues.

10. Conclusion:

Dhaka's informal economy, an intricate tapestry of rickshaws, vendors, laborers, and more, is both its backbone and its pulse. While grappling with challenges like lack of formal recognition, vulnerability to exploitation, and absence of social protections, it remains a reservoir of resilience and adaptability. The sector embodies vast untapped potential: providing vast employment opportunities, meeting essential daily needs, and upholding Dhaka's vibrant culture. Navigating its complexities requires an appreciation of its value and strategic interventions that not only address its challenges but harness its immense opportunities for a more inclusive and prosperous Dhaka.

Reference

1. Ahmed, F. (2001). History of street vendors in Dhaka City. Dhaka University Journal of Business Studies.
2. Ahmed, I. (2000). The heritage of the Rickshaw: History and culture of Rickshaws in Asia. South Asian Studies.
3. Ahmed, W., & Ahmed, R. (2018). The urban informal sector and its dynamics: A study on waste pickers in Dhaka City. Dhaka University Journal of Business Studies.
4. Begum, S., & Nazneen, S. (2017). Domestic workers in Bangladesh: Exploitation, vulnerabilities, and the need for regulation. South Asia Journal of Social Sciences.
5. Hossain, A. (2019). Challenges faced by street vendors: A study on Dhaka. South Asian Journal of Social Sciences.
6. International Labour Organization (ILO). (2019). Informal economy in Bangladesh.
7. Khan, A. M. (2016). The construction industry in Dhaka: Growth, challenges, and future prospects. Bangladesh Journal of Development Studies.
8. Rahman, M. S. (2017). Informal Economy in Dhaka City: Autonomy and Regulation. Journal of Economic and Social Geography.
9. Siddiquee, I., & Parveen, S. (2019). Rickshaw art of Bangladesh: A socio-cultural study. Bangladesh Journal of Art & Culture.
10. Siddiqui, T. (2018). Migration and the urban informal sector: A case study of Dhaka. Bangladesh Development Studies.

ফটোগ্যালারি
৩

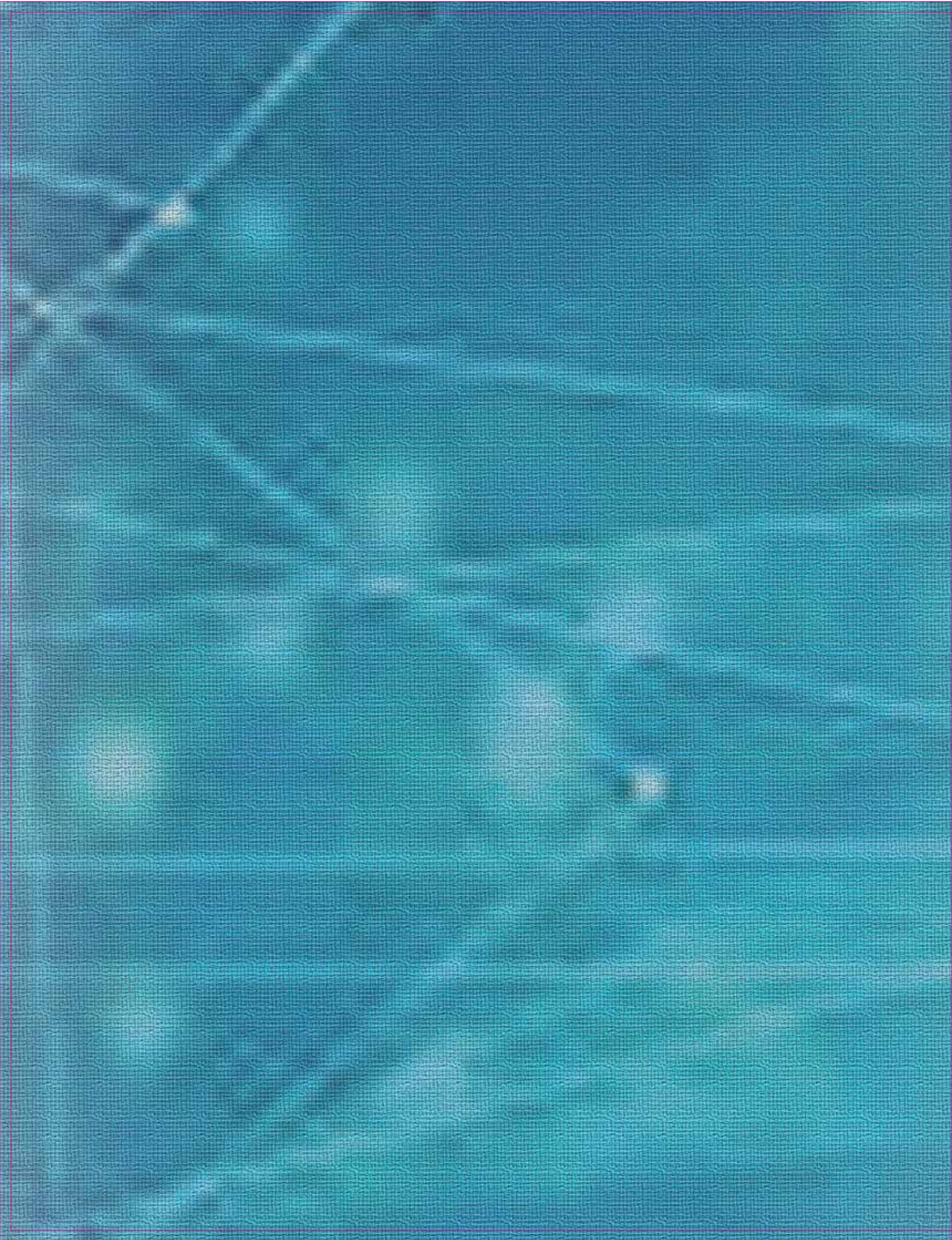

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

শেখ জামাল দিবস উপলক্ষে এইচবিআরআই কর্তৃক আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের মূল অধিবাসী ও সাধারন ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাটাগরিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৪৪০ জন বরাদ্দ গ্রহীতার অনুকূলে প্লটের আইডি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২-২০৩৫ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পের অবস্থা ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মশালায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

শুদ্ধাচার শীর্ষক সেমিনারে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনীতে উপস্থিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন।

এইচবিআরআই কর্তৃক বিশ্ব বসতি মেলা-২০২২ উদ্বোধনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

এইচবিআরআই কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার অঙ্গীকারের দেয়ালিকায় স্বাক্ষর করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

অগ্নিঝুঁকি ও অর্থনৈতিক সহনশীলতা: ঢাকা নগরীর উপর একটি সমীক্ষা

নম্রতা দাস, ফাতেমা তুজ জোহরা ও মো. জাহিদ হাসান*

ভূমিকা

অগ্নি, একটি বিপর্যয়মূলক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উভয়ভাবেই হতে পারে। যেখানে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি আছে, সেখানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে খুব সহজেই তা বড় ধরনের দুর্ঘটনা হিসেবে আঘাত হানে (Haque, 2001)। নগরাঞ্চলে অগ্নিদুর্ঘটনা বিরল কিছু নয়। বর্তমানে অনেক দেশ, অনেক শহরই এর শিকার। লন্ডনে ধ্বংসাত্মক অগ্নিদুর্ঘটনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ অব্দি লন্ডন শহর অনেক বড় বড় অগ্নিদুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যার বেশির ভাগই ঘটে গৃহস্থালির চুলার আগুন থেকে। The Encyclopedia of World Problems and Human Potential-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বার্ষিক অগ্নি ক্ষয়ক্ষতি আনুমানিক ৫,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৮০-৮৫% নগরাঞ্চলে অগ্নিদুর্ঘটনার দরুণ। শহুরে দালানগুলোর ঘনত্ব ২০-৩০ শতাংশ হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬৫ শতাংশের মতো হতে পারে, যা বেড়ে ৮০% অব্দি যায় যদি দালানের ঘনত্ব ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরো কিছু সুপরিচিত অগিদুর্ঘটনার উদাহরণ শিকাগো, বোস্টন এবং বাল্টিমোর যা পর্যায়ক্রমে ১৮৭১, ১৮৭২ এবং ১৯০৪ সালে ঘটে। আমাদের এশিয়া মহাদেশও এই ভয়াবহতা থেকে মুক্ত নয়। এক্ষেত্রে অন্যতম বিখ্যাত ঘটনা ২০১০ সালে সাংহাই শহরে সংঘটিত অগ্নি দুর্যোগ। সাংহাইতে ২৮তলা উচ্চ ভবনে ১৫ নভেম্বর, ২০১০ সালে আগুন লাগে, যেখানে হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। এর কারণ হিসেবে পরবর্তীতে উদঘাটিত হয় যে, লাইসেন্সবিহীন শ্রমিকদের কর্তৃক ওয়েল্ডিং এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকায় সেখান থেকে সৃষ্ট আগুনের ফুল্কি পরবর্তীতে বিরাট আগুনের সৃষ্টি করে। সেই আগুন ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিরাজমান ছিল এবং উদ্ধার কার্যে ১০০টিরও অধিক অগ্নিনির্বাপক গাড়ির প্রয়োজন পড়েছিলো।

বাংলাদেশও এই মারাত্মক ঝুঁকির শিকার। শহরাঞ্চল যেখানে নগরায়নের হার বেশি, বিশেষত ঢাকা শহর যা দেশের রাজধানী এবং শিল্প, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। যার ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহর অর্থনৈতিক অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। ঢাকা শহরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে অগ্নিকাণ্ডের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটে থাকে। নিয়মিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দরুন রাজধানী শহর ঢাকার সার্বিক আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব দৃশ্যমান। এইসব ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে বসতবাড়ি এবং শপিং মল-এর ক্ষতি, কর্মসংস্থানে ঝুঁকিসহ আরো হানি ঘটে।

নগরায়ন ও অগ্নিদুর্ঘটনা

শহুরে অগ্নিদুর্ঘটনার প্রবণতা একটি এলাকার নগরায়নের হারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং বিশ্বব্যাপী এই নগরায়ন অত্যন্ত দ্রুত ঘটছে। ২০০৭ সাল অব্দি ৩.৩ বিলিয়ন মানুষ নগর এলাকায় বসবাস করতো, যা বৃদ্ধি পেয়ে মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই বৃদ্ধির হার ২০৫০ সাল অব্দি ৬৬ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে। নগরায়নের যেমন সুবিধা আছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো উন্নত জীবনব্যবস্থা ও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ, এই উন্নয়ন কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি করে। সাধারণত, নগরায়ন প্রক্রিয়া এবং শিল্পায়ন ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উৎপাদন ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। যার কারণে ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবর্তনের পাশাপাশি, নগরায়ন একটি শহরকে অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান হিসেবে পরিবর্তিত করে। Wang (2011) মন্তব্য করেছেন যে, শহুরে অগ্নিদুর্ঘটনাগুলো ঘটার প্রবণতা নগরায়নের হারের উপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল, এবং বিশ্বব্যাপী এই নগরায়ন দ্রুত ঘটছে। অনিয়ন্ত্রিত আগুন আজকের সমাজে হতাহতের ও সম্পত্তির ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ (Poerbo, 1998)। দ্রুত নগরায়ন বসতবাড়ির ঘনত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূলচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, যা পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিত উভয় বসতিতেই লক্ষণীয়। এর ফলশ্রুতিতে ফায়ার ব্রিগেড

*এম.এস. শিক্ষার্থী, শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২২,ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর ভারী যানবাহন বসতির সরু সড়ক এর ভিতরে প্রবেশে ব্যর্থ হয় বা বিলম্ব হয়, যা অগ্নিকাণ্ডের দরুন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দেয় (Schneid and Collins, 2001)। ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় আগুনের প্রাদুর্ভাব সহজেই হতে পারে, যা একের পর এক সংলগ্ন ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। 'Fire occurrences are responsible for extensive damage on the urban environment and the cause of numerous fatalities' (Himoto and Tanaka, 2008).

অগ্নিঝুঁকির বিশেষ ক্ষেত্রগুলো হলো : শহরের পুরাতন অংশগুলো বা পুরাতন এলাকাগুলো, যেখানে ভবনগুলো এক স্থানে ঘিঞ্জি অবস্থায় রয়েছে। এসব এলাকায় আগুন বিস্তার রোধের জন্য প্রশস্ত রাস্তা খোলা থাকে না। আকাশচুম্বী ভবনগুলো অনেক সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় গড়ে উঠে, বা অনেক সময় একটি পুরাতন ভবনের উপরে নতুন অতিরিক্ত তলা স্থাপন করে ঝুঁকির মান বাড়িয়ে তোলা হয়। অপর্যাপ্ত নগর পরিকল্পনা, অপরিকল্পিত অবকাঠামো এবং অপরিমিত অগ্নি প্রতিরোধ এবং প্রশমন সম্পর্কিত নির্মাণ অনুশীলনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্নি বিস্তার এবং সম্ভাব্য অগ্নিদুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিপদগুলোর মধ্যে একটি, বিশেষ করে শহর ও শিল্প এলাকায়। ২০২২ সালে, রিপোর্ট করা অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ২৪,১০২, এবং আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ছিল ৩২৪ কোটি টাকা, যার কারণে বাংলাদেশে ৮৫ জন মারা গেছে এবং ৩৭৭ জন আহত হয়েছে (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ২০২২)। বাংলাদেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, মানুষের কর্মকাণ্ড এবং অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রামীণ জনবসতির তুলনায় শহুরে বসতিতে আগুনের উচ্চ ঝুঁকির জন্য দায়ী। ঢাকা শহর ও এর আশপাশের এলাকায় সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটে। অষধস এবং ইধৎড়র (২০০৪) তাদের গবেষণায় বলেছেন যে ঢাকায় ৬০% এরও বেশি অগ্নিকাণ্ডে ঘটনা ঘটে দুপুর থেকে মধ্যরাতের মধ্যে এবং শুষ্ক মৌসুম (ডিসেম্বর থেকে মার্চ) বছরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময় (আর্দ্র মৌসুমের তুলনায় প্রায় দুবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে)। রহমান ও ইসলাম (২০১৯) তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের জন্য বাণিজ্যিক ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৯ সালে ৩১টি বস্তির উপর একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (২০২০) রিপোর্ট করেছে যে অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং অনেকের প্রাণহানি ঘটে; অনেক লোক গৃহহীন হয়ে যায় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলে, বিশেষ করে যারা বস্তি এলাকায় বসবাস করে।

ঢাকা শহরের অগ্নিকাণ্ডের পরিস্থিতি

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। এটি বিশ্বের নবম বৃহত্তম এবং সপ্তম-সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ২০২২ সালের ডাটাবেস অনুযায়ী, ১০.২ মিলিয়ন বাসিন্দার জনসংখ্যা এবং বৃহত্তর ঢাকায় ২২.৪ মিলিয়ন বাসিন্দার জনসংখ্যাসহ ঢাকাকে একটি মেগাসিটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ঢাকা শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ বিল্ট-আপ শহুরে এলাকা করে তোলে। বাণিজ্যিক, আবাসিক এবং শিল্প ভবনসহ বিল্ট-আপ অবস্থানগুলোর এই বিশাল ঘনত্বের কারণে, এই শহরটিতে বিশাল জনবাহুল্যের প্রবণতা দেখা দেয়, যা শহরটিকে আকস্মিক কিছু দুর্ঘটনার জন্য বিপদাপন্ন করে তোলে। এইসব দুর্ঘটনাগুলো শুধু মানুষের জীবনই নষ্ট করে না, বরং শহরবাসীদের জন্য সম্পত্তি, অর্থনীতি এবং বসবাসের জায়গাগুলিরও ক্ষতি করে। যানজটপূর্ণ এ শহরের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিপদের মধ্যে একটি হলো অগ্নিকাণ্ড।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী শহরের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও বাধাগ্রস্ত করে, যা সমগ্র জাতি পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে কঠিন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এই ঘটনাগুলো কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়, এবং তারা যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে এই সমস্যাটি প্রশমিত করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তা স্বত্ত্বেও, দুর্ঘটনাগুলো এমন সকল পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটায়, যা ক্ষতিকারক সম্ভাব্য পরিণতির সৃষ্টি করে। ক্যামব্রিজ ইংরেজি অভিধান ২০১৭ অনুযায়ী, "Hazards comprise events that result in harmful potential consequences such as injury, loss of life and damage to property or environment"।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর অগ্নিকাণ্ডের ডেটা এবং ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঘনবসতি এবং নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ট দালানসমৃদ্ধ নগরীগুলোই সর্বাপেক্ষা বেশি অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়, যার সিংহভাগ ঘটে ঢাকা শহরে, যার কারণ ঢাকায় বসবাসকারী মানুষ এবং তাদের কাঙ্খিত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দালানের আধিক্য। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এর উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিরাট পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি প্রতি বছরই দেখা দিচ্ছে, এবং এই হার ক্রমাশয়ই বৃদ্ধির দিকে। এই বৃদ্ধির মূল কারণ যে ক্রমবর্ধমান দালান সংখ্যা এবং তার অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অতি সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকেই তা বোধগম্য।

মানচিত্র-১: ঢাকা শহরের ২০১০ এবং ২০২২ সনের তুলনামূলক অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা

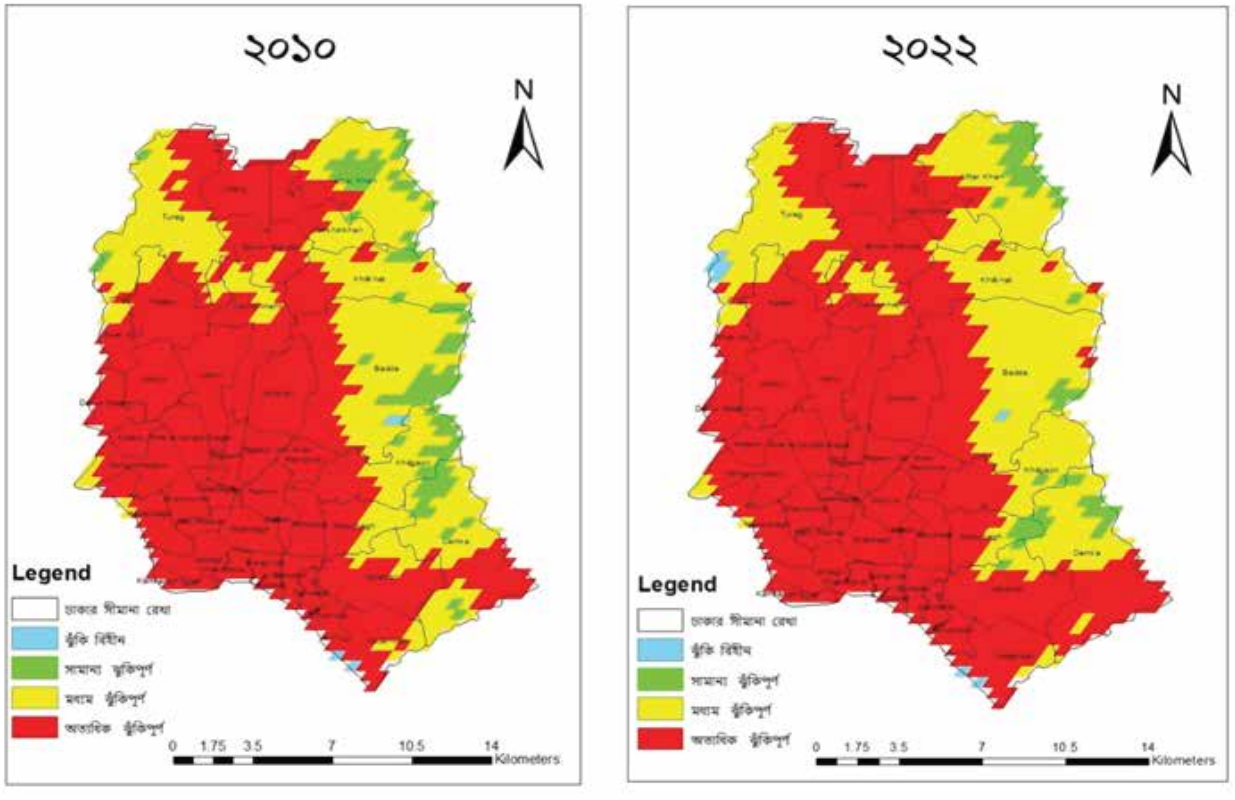

মানচিত্র-১এ স্পষ্ট দৃশ্যমান যে, বিগত ১২বছরে ভূমি ব্যবহারে বিরাট ধরনের কোনো পরিবর্তন সমগ্র ঢাকা শহরে না এলেও, নগরে দালানের সংখ্যা বিগত বছরগুলো থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরানো ঢাকা এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির উপস্থিতি এবং এর অব্যবস্থাপনা এর আশপাশের সমগ্র এলাকাকে অত্যধিক বিপদসংকুল করে তোলে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পাঁচ বছর আগের তথ্যমতে, ঢাকা শহরের ভবনের সংখ্যা ২২ লাখ। এখন আরও বেশি। সে সময় অতি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা ছিল ৩২১, এখন যা ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। সেখানে মানুষ এখনো বসবাস করছে, কারখানা চলছে। ফলে কিছুদিন পরপর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। সরকার এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

এই পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে অধিক জনবাহুল্য সৃষ্টি হয়, এবং সমগ্র এলাকাকে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে, যা মানচিত্রে লাল দাগে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই তুলনায় অন্যান্য এলাকাসমূহ যেমন সবুজ বৃক্ষ সমৃদ্ধ এলাকা এবং তৃণভূমি এলাকাসমূহকে মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে, চাষাবাদী এলাকার পরিমাণ কম থাকায় একে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে এবং জলভূমি এলাকাগুলোকে ঝুঁকিবিহীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে হলুদ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে সবুজ এবং ঝুঁকিহীন এলাকাকে নীল দাগে যথাক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, অগ্নিকাণ্ডের মতো আকস্মিক ঘটনা মানবসৃষ্ট এবং প্রযুক্তিগত উভয় ধরনের দুর্যোগ এর আবির্ভাব ঘটায়। "They include both man-made and technological events (EU 2016)." উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নগর এলাকার আশপাশে আবাসনের সাম্প্রতিক উন্নয়ন যা রাস্তাগুলিতে অত্যধিক ভীড় সৃষ্টি করে, যার দ্বারা অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামগুলি সময়মতো দুর্ঘটনাস্থলে প্রবেশ করতে বিফল হয়। একইভাবে একটি প্রযুক্তিগত বিপদ একটি বাড়িতে অনিরাপদ নিত্য বৈদ্যুতিক ব্যবহারের মতো সহজ কিছুও হতে পারে। এই বিষয়গুলো উপশম প্রক্রিয়াটিকে কল্পনার চেয়েও কঠিন করে তোলে।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের ২০২২ ও ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সারা দেশে এই দুই বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৬৩টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আগের ১৪ মাস ১০ দিনে সারা দেশে অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছে ১৪৫ জন। ২০২২ সালে সারাদেশে ২৪ হাজার ১০২টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এসব ঘটনায় ৩৪২

বছর	ঘটনার সংখ্যা	ক্ষয়ক্ষতি (মিলিয়ন টাকা)
২০১০	২৬৬৯	১৪৭০
২০১১	২৪২২	৯৬০
২০১২	২৭৯৪	২৪০০
২০১৩	২৮৯১	৪০৭০
২০১৪	২৬৭০	৩৬৬৯
২০১৫	২৪৯৯	৬৬৭৫
২০১৬	২৬০৫	৯৩৭
২০১৭	২৪৩১	৪৯৮
২০১৮	২৭৬২	১০০০
২০১৯	২৭৭১	৩৫৪

উৎস: *বার্ষিক পরিসংখ্যান উপাত্ত - ফায়ার সার্ভিস ও সিভিলডিফেন্স অধিদপ্তর, বাংলাদেশ*

টেবিল-১: *ঢাকা শহরের ২০১০ থেকে ২০১৯ সালে সংঘটিত অগ্নিদুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি*

কোটি টাকার বেশি সম্পদ পুড়েছে। এর আগের বছর ২১ হাজার ৬০১টি অগ্নিকাণ্ডে ২১৮ কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে যায়। আর ২০২০ সালে সারাদেশে ২১ হাজার ৭৩টি আগুনের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৪৬ কোটি টাকা।

বছর	ঘটনার সংখ্যা	ক্ষয়ক্ষতি (মিলিয়ন টাকা)
২০২০	২১০৭৩	২৪৬৬
২০২১	২১৬০১	২১৮৩
২০২২	২৪১০২	৩৪২৬

উৎস : বার্ষিক পরিসংখ্যান উপাত্ত - ফায়ার সার্ভিস ও সিভিলডিফেন্স অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরবর্তী বছরগুলোতে সমগ্র দেশের একটি চিত্র যদি তুলে ধরা হয়, তাহলে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বার্ষিক পরিসংখ্যান উপাত্ত থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে নিম্নরূপ অবস্থা দেখা যায়।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস প্রদত্ত উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের থেকে বৃদ্ধি পায়, এবং সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ বছর আগের অবস্থা থেকে ক্রমশ বাড়ছে। যা প্রকাশ করে যে নগর পরিকল্পনা এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনসমূহের ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতি ঘটেছে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়। যার ফলশ্রুতিতে, অগ্নিদুর্ঘটনার মতো দূর্যোগ আজ দেশের সার্বিক অর্থনীতির নিম্নমুখী গতিবিধির পিছনে জড়িত।

গ্রাফ-১: ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতি বছরে ঢাকায় অগ্নিকান্ড দূর্ঘটনা জনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমান (মিলিয়ন টাকা)

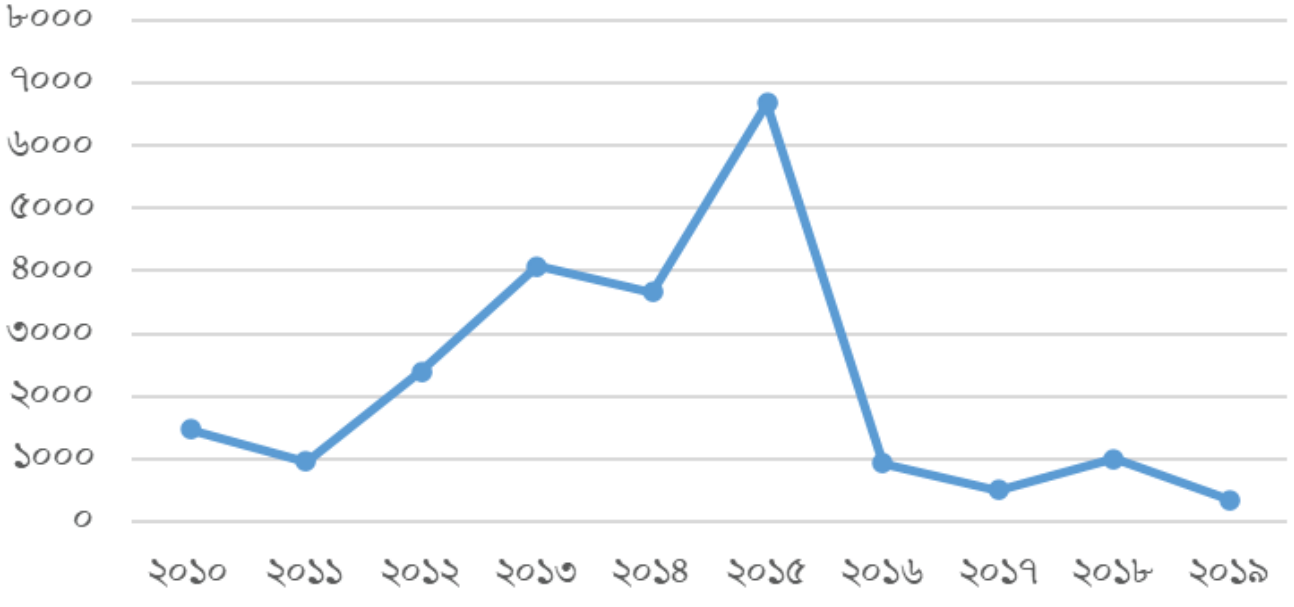

গ্রাফ-২: ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকায় সংঘটিত মোট অগ্নিকান্ডের সংখ্যা

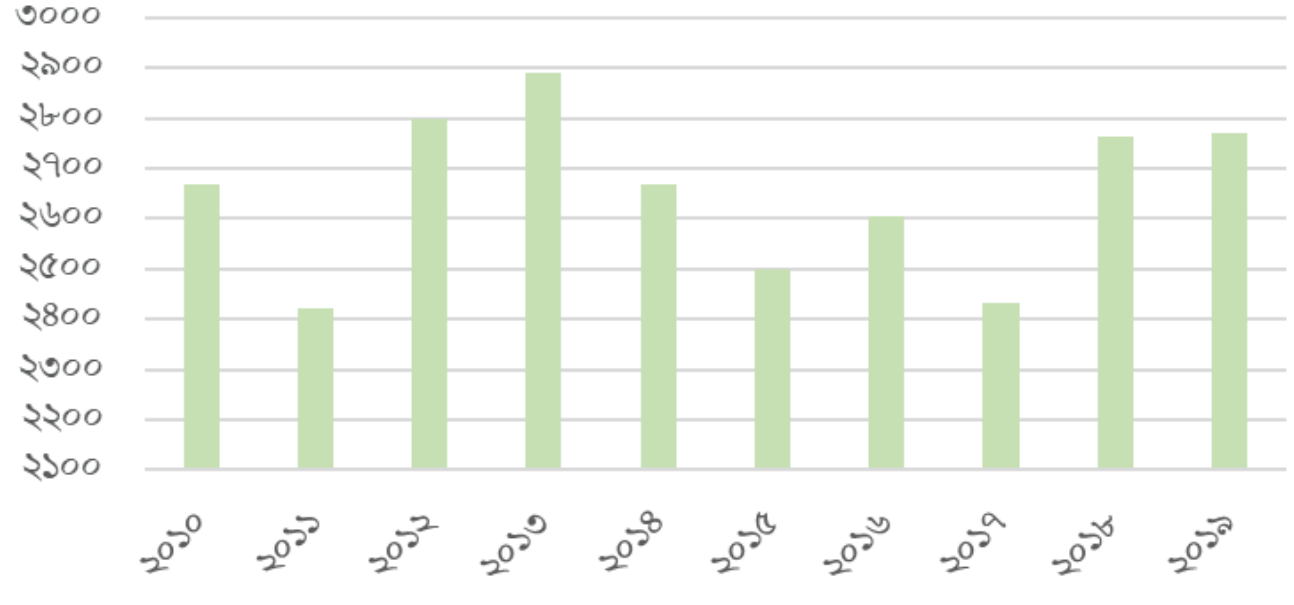

শুধু ঢাকার চিত্রই এমন নয়। সারা বাংলাদেশেই অগ্নিদুর্ঘটনার ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়, যার মূল কারণ সব মিলিয়ে একটাই, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং তার নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থাপনার অভাব।

গ্রাফ-৩: ২০২০ - ২০২২ সনে সমগ্র দেশে অগ্নি দূর্ঘটনার কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)

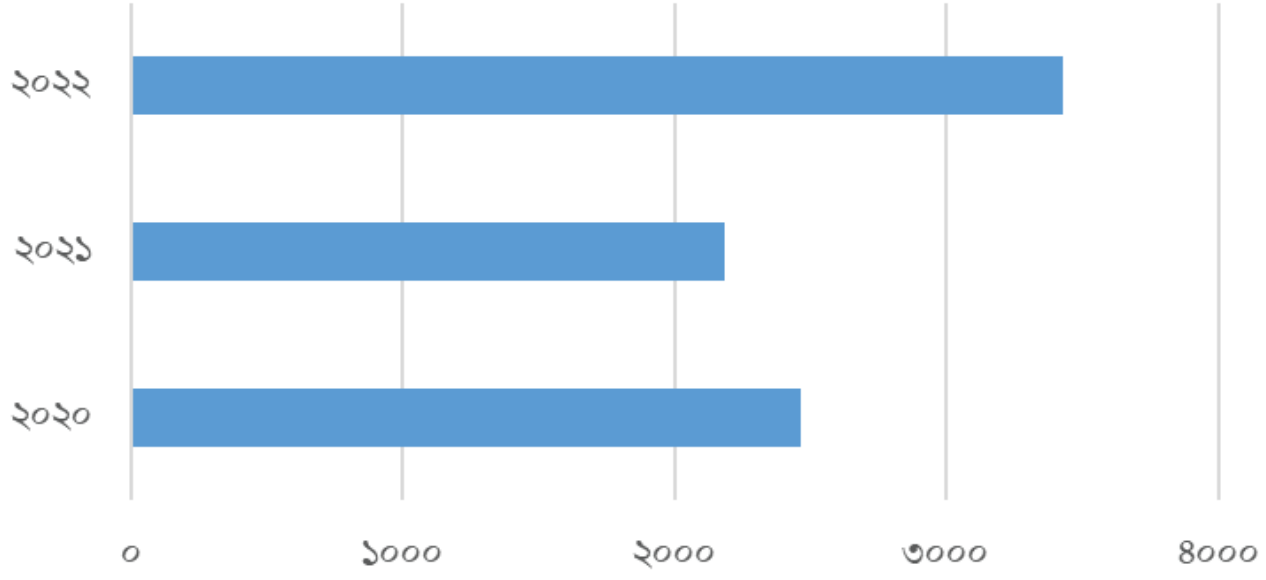

গ্রাফ-৪: ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সারা দেশে প্রতি বছরে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের সংখ্যা

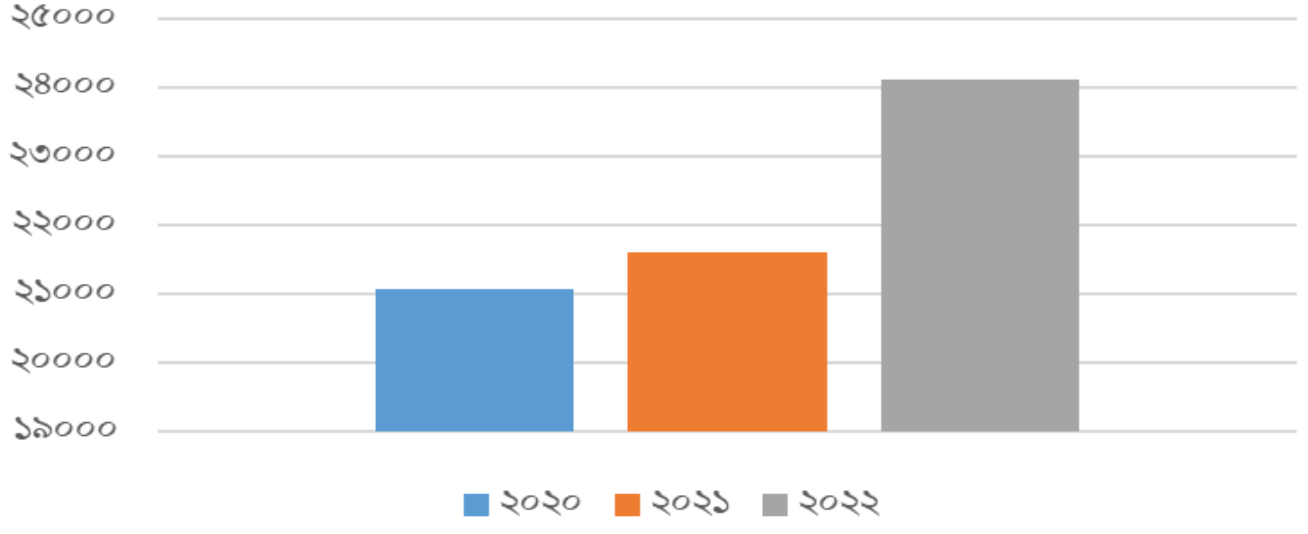

কেস স্টাডি–১ : বঙ্গবাজার অগ্নিদুর্ঘটনা

গত ৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে রাজধানীর বঙ্গবাজার এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে প্রায় চার হাজার দোকান। বঙ্গবাজার কমপেক্সসহ মহানগর শপিং কমপ্লেক্স, এনেক্সকো টাওয়ার, বঙ্গ ইসলামিয়া মার্কেট ও বঙ্গ হোমিও কমপ্লেক্সের এসব দোকানের মোট ৩০০ কোটি টাকার ওপরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। (প্রথম আলো, ২০২৩)

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানীর বঙ্গবাজারে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হওয়া বঙ্গবাজার কমপ্লেক্সের চারটি ইউনিট (বঙ্গ, গুলিস্তান, মহানগরী ও আদর্শ) মিলে মোট দোকান ছিল ২ হাজার ৯৬১টি। এখন এই দোকানগুলোর চিহ্ন নেই। এছাড়া মহানগর শপিং কমপ্লেক্সে ৭৯১টি, বঙ্গ ইসলামিয়া মার্কেটে ৫৯টি ও বঙ্গ হোমিও কমপ্লেক্সে ৩৪টি দোকান আগুনে পুড়েছে। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৮৪৫টি দোকানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, বঙ্গবাজারে সব মিলিয়ে ৩০৩ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। (প্রথম আলো, ২০২৩)

বঙ্গবাজারে আগুনের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ১৯৯৫ সালে এবারের মতোই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। তারপর আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয় বাজারটি। তবে বাজার তৈরির সময় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। এ কারণে ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই আবার আগুন লাগে এবং গুলিস্তানের পাশের বহু দোকান পুড়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম, ফায়ার সার্ভিস বলেছে, ২০১৯ সালে বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে তারা নোটিশ দিয়েছিল; কিন্তু মার্কেট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। ফলে এবারের ভয়াবহতা দেখতে হলো। (প্রথম আলো, ২০২৩)

ছবি-১ : ৪ এপ্রিল, ২০২৩ এ ঢাকার বঙ্গবাজারে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতার চিত্র (সোর্স : প্রথম আলো)

অগ্নিদূর্ঘটনায় সহনশীলতা বৃদ্ধিতে সম্ভাব্যকরণীয়

অতীত বছরের ঘটনাসমূহের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি তুলনা করলে দেখা যায়, সার্বিক অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, ক্ষয়ক্ষতির মান ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা বিরাজমান। আক্রান্ত নগরবাসী খুব দ্রুত তাদের পরিস্থিতি উন্নয়নে তৎপর, এবং তারা তা প্রতিকারে উৎসুক। এ ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনয়ন করা গেলে অগ্নিঝুঁকির পরিমাণ আরো নিয়ন্ত্রণে আনার সম্ভাবনা আশা করা যায়। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্নিঝুঁকি কমানোর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

- প্রচলিত আইনের ব্যবহার করতে হবে।
- বিল্ডিং কোড-এর প্রণয়ন এবং অনুসরণ করা যুক্তি যুক্ত।
- ফায়ার এলার্ম-এর প্রবর্তন এবং পরিচালনা করা।
- বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভবনে অগ্নিনিরোধক যন্ত্রাদি বসানো এবং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষন করা।
- আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠানাক রা।
- বৈদ্যুতিক তার, সার্কিট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

উপসংহার

ঢাকা নগরীর মতো ক্রমবর্ধমান নগরায়ন খুব কম সংখ্যক শহরেই দৃশ্যমান, যা ঢাকা শহরকে বসবাসের জন্য অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঢাকা এমন একটি শহর, যেখানে কর্মসংস্থান, উন্নত জীবনযাত্রা, এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব অর্থনীতির উপর চাপ কমানো এবং যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আর্থিক, বাণিজ্যিক এবং শৈল্পিক স্থিতিশীলতা আনাটাই কাম্য। বিভিন্ন ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে এর বিরুদ্ধে সহনশীলতা গড়ে তোলাই একটি সুস্থ নগরজীবন আনয়নের মূল চাবিকাঠি।

রেফারেন্স

১। Rahman, Md. Marufur. (2020). Fire Risk Situation Analysis in the Nimtoli Area of Old Dhaka. Journal of the Asiatic Society. 46. 91-102. 10.3329/jasbs.v46i1.54232.

২। বার্ষিক পরিসংখ্যান, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল অধিদপ্তর।

৩। Navitas, Prananda. (2014). Procedia-Social and Behavioral Sciences. 135. 178–183. 10.1016/j.sbspro.2014.07.344.

৪। World Bank. 2020. Urban FRAME: Urban Fire Regulatory Assessment and Mitigation Evaluation Diagnostic. © World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/34671 License: CC BY-NC 3.0 IGO.Ó

৫। Mtani, I. W., &Mbuya, E. (2018). Urban fire risk control: House design, upgrading and replanning. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 10(1). https://doi.org/10.4102/jamba.v10i1.522

৬। Urban fires | World Problems & Global Issues | The Encyclopedia of World Problems. (n.d.). http://encyclopedia.uia.org/en/problem/153370

৭। Kabir, Md.H., Sato, M., Habbiba, U. and Yousuf, T.B. (2018). Assessment of Urban Disaster Resilience in Dhaka North City Corporation (DNCC), Bangladesh. Procedia Engineering, 212, pp.1107–1114. doi:https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.143.

৮। Islam, M.M. and Adri, N. 2008. Fire hazard management of Dhaka city: addressing issues relating to institutional capacity and public perception. Jahangirnagar Planning Review6: 57-68. Bangladesh fire service and civil defense.

৯। Sahebi, M.T., Rahman, M.M. and Rahman, M.M. (2021). Fire Risk Situation Analysis in the Nimtoli Area of Old Dhaka. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Science, 46(1), pp.91–102. doi:https://doi.org/10.3329/jasbs.v46i1.54232.

১০। সুকান্তদাস (২০২৩).অনিয়মের সংস্কৃতি থেকেই বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ড. Prothomalo. Available at: https://www.prothomalo.com/opinion/letter/7ozzagk42s [Accessed 15 Sep. 2023].

ফটোগ্যালারি
৪

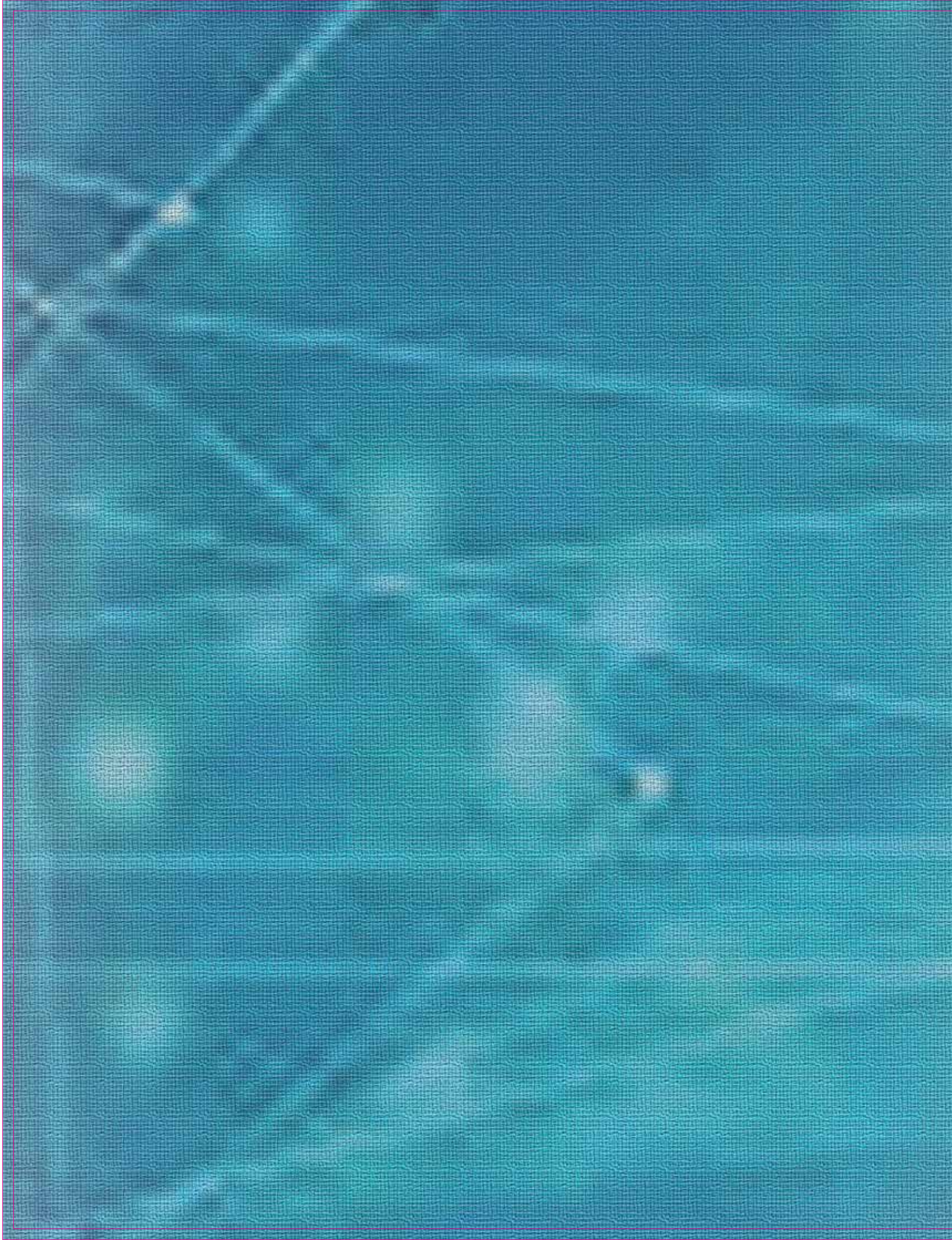

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১১টি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকতাই খালের বাঁধ ও রাস্তার কাজ পরিদর্শনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি.

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কনস্ট্রাকশন কাজ পরিদর্শনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এপার্টমেন্ট প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রোড সংস্কার কাজ পরিদর্শনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ওয়াকথন

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক "কুয়াকাটা ট্যুরিজম সেন্টার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার

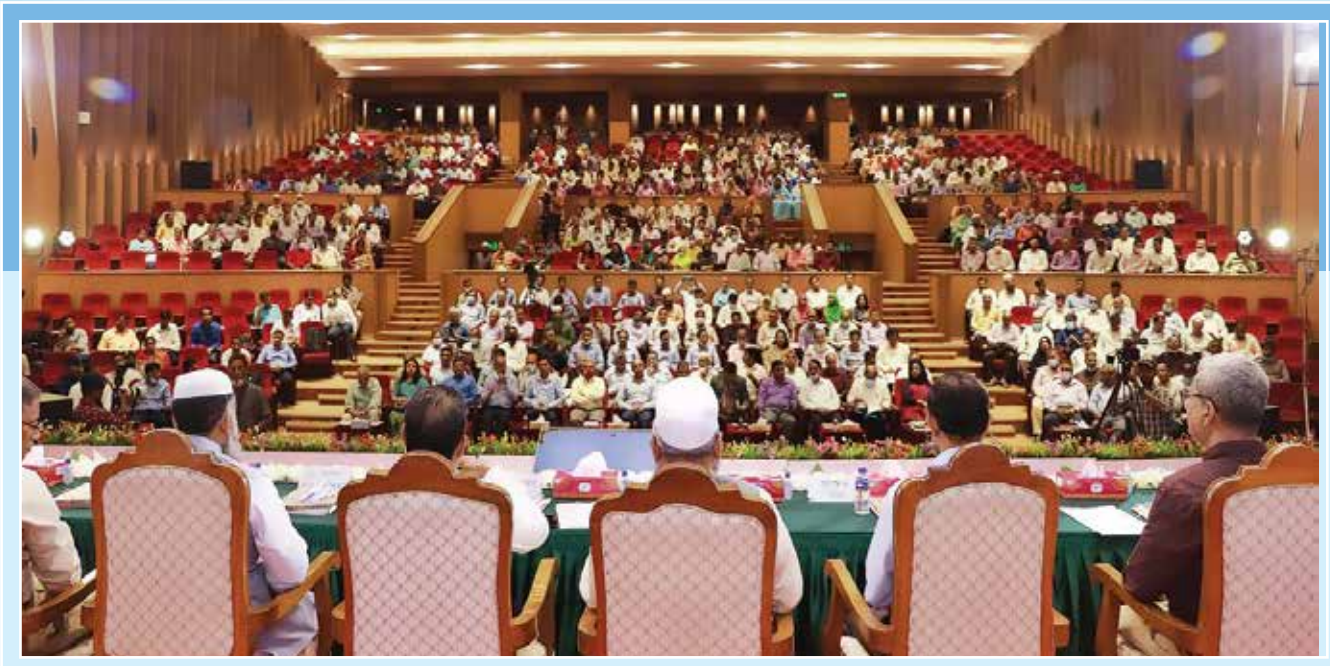

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব বসতি দিবস ২০২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে দর্শক গ্যালারি

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার

গণপূর্ত অধিদপ্তর আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এম.পি

আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে গণপূর্ত অধিদপ্ত-এর প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২৩

উদ্‌যাপন কমিটি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপ কমিটি

১. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩. মহাপরিচালক, এইচবিআরআই	সদস্য
৪. জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক, ঢাকা।	সদস্য
৫. জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য (প্রকৌশল ও সমন্বয়), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (যুগ্মসচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঞা, পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮. জনাব নায়লা আহমেদ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯. জনাব মোঃ শহিদুল আলম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ: দা:) (সংস্থাপন ও সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
১০. ডঃ খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	সদস্য
১১. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপসচিব (বাজেট অধিশাখা-৪), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২. জনাব শেখ মোঃ কুদরত-ই-খুদা, প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরিকালচার গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
১৩. ড. মোঃ ফারুক হোসেন, সহযোগি অধ্যাপক, চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
১৪. জনাব স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
১৫. জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
১৬. জনাব মহিবুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪	সদস্য
১৭. জনাব মিহির কান্তি সরকার, সিস্টেম এনালিস্ট, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮. শেখ নূর মোহাম্মদ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

ভিডিও প্রস্তুত এবং সম্প্রচার সংক্রান্ত উপ-কমিটি

১. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব নায়লা আহমেদ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩. জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-১৪), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. জনাব মোঃ শামছুদ্দোহা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৫. জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১ এ সংযুক্ত), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. জনাব মোঃ পারভেজ খাদেম, প্রিন্সিপাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনিস্টিটিউট	সদস্য
৭. জনাব নুর শাহরিয়ার বিন রহমান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০. চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪. গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৫. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৬. জনাব মোঃ শহিদুল আলম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ: দা:) (সংস্থাপন ও সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

বাণী সংগ্রহ ও ক্রোড়পত্র প্রকাশনা সংক্রান্ত উপ-কমিটি

১. সৈয়দ মামুনুল আলম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-৯), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩. জনাব ফাহমিদা সুলতানা, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-৩), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫. জনাব অভিজিৎ রায়, উপসচিব (মনিটরিং অধিশাখা-১০), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. জনাব মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-৭), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. জনাব মোহাম্মদ খাদেমুর রহমান, সহকারী সচিব (মনিটরিং শাখা-১০ এ সংযুক্ত), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮. জনাব রুবিনা ইসলাম, উপনগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক	সদস্য
৯. জনাব সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, নগর গবেষণাকেন্দ্র	সদস্য
১০. রিহ্যাব এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২. জনাব তারিক হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা শাখা-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

স্মরণিকা প্রকাশ উপ-কমিটি

১. জনাব মোঃ হামিদুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব মোঃ শামছুদ্দোহা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন	সদস্য
৩. জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন খান, যুগ্মসচিব (আইন কর্মকর্তা-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-১৫), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫. জনাব রুবায়েত হায়াত শিপলু, সিনিয়র সহ: সচিব (মনিটরিং শাখা-১১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. জনাব মোঃ মমিন উদ্দিন, পরিচালক (প্রশাসন), রাজউক, ঢাকা।	সদস্য
৭. জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮. জনাব সায়কা বিনতে আলম, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯. জনাব মোঃ নাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, এইচ বি আর আই	সদস্য
১০. জনাব সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, নগর গবেষণাকেন্দ্র	সদস্য
১১. জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২. বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স	সদস্য
১৩. সম্পাদক (প্রকাশনা), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য
১৪. জনাব উদয় শংকর দাস, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৫. প্রফেসর ড. কাজী ফজলুল হক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৬. সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৭. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
১৮. জনাব অভিজিৎ রায়, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রচার বাস্তবায়ন উপ-কমিটি

১১. জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য (প্রকৌশল ও সমন্বয়), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (যুগ্মসচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫. জনাব মো: আশরাফ, নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬. জনাব মোঃ শরাফত আলী, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১৬, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. জনাব মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৮. জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৯. জনাব ইয়াসির আরাফাত, প্রযোজক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
১০. বাংলাদেশ বেতারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. রিহ্যাব এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপসচিব (বাজেট অধিশাখা-৪), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

র‍্যালি বাস্তবায়ন উপ-কমিটি

১. জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি, চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।	আহবায়ক
২. জনাব মুহাম্মদ সোহেল হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১৭), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩. জনাব মুহাঃ মাছুম বিল্লাহ, উপসচিব (আইন কর্মকর্তা-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪. খোন্দকার রেবেকা সান-ইয়াত, কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর (কাপ)	সদস্য
৫. জনাব বিধান রায়, উপপরিচালক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬. জনাব মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৭. জনাব ফেরদোস হাসন খান, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট	সদস্য
১০. রিহ্যাব এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউটট অব প্ল্যানার্স এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২. ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩. জনাব সাবরিনা আক্তার, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট	সদস্য
১৪. ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৫. জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬. জনাব দেবময় দেওয়ান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-৮), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

সেমিনার বাস্তবায়ন উপ-কমিটি

১. ড. নীলোপল অদ্রি, সহকারী অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ ইটউএঃ	আহবায়ক
২. সদস্য (প্রকৌশল ও সমন্বয়), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩. জনাব মোঃ শামছুদ্দোহা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন	সদস্য
৪. অধ্যাপক ড, নাহিদ রেজওয়ানা, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫. এস. এম মেহেদী আহসান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স	সদস্য
৬. জনাব মোঃ আলমগীর, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা-৩), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. জনাব সায়কা বিনতে আলম, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮. জনাব মোঃ নাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, এইচ বি আর আই	সদস্য
৯. জনাব খোন্দকার রেবেকা খান-ইয়াত, নির্বাহী, পরিচালক, সেন্টার ফর আরবান ফোরাম	সদস্য
১০. সেন্টার ফর আরবান ফোরাম এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১. জনাব খোন্দকার রেবেকা সান-ইয়াত, কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর (কাপ)	সদস্য
১২. জনাব আক্তারুজ্জামান, টঘ ঐধনরঃধহঃ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৩. জনাব সাবরিনা আকতার সম্পাদক (সেমিনার) ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য
১৪. সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৫. জনাব মাহফুজা আক্তার, টাউন প্ল্যানার (বাস্তবায়ন) রাজউক	সদস্য
১৬. জনাব এ কে এম আব্দুল মোতালেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা	সদস্য
১৭. জনাব আহমেদ আখতারুজ্জামান, উপ-পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৮. জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-৬), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

আমন্ত্রণপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ উপ-কমিটি

১. জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা-৯), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-৩), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩. জনাব স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	সদস্য
৪. জনাব নূর শাহরিয়ার বিন রহমান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫. জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	সদস্য সচিব

বিভাগীয় পর্যায়ে বিশ্ব বসতি দিবস উপযাপন সংক্রান্ত উপ-কমিটি

১. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা (যুগ্মসচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৩. জনাব বিজয় কুমার মন্ডল, সদস্য (পরিকল্পনা, নকশা ও বিশেষ প্রকল্প) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সচিব (উপসচিব), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মজুমদার, সিনিয়র সহঃ সচিব (প্রশাসন শাখা-১২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬. জনাব, সাইয়েদ ফুয়াদুল খলিল আল ফাসো, নগর পরিকল্পনাবিদ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮. জনাব মোঃ ইজাদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন),খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯. জনাব মোঃ আবুল হাসেম, সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১০. জনাব মাকসুদ হাসেম, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১১. জনাব সাহেলা আক্তার, উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১৩), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব